গলার কাঁটা

সপ্তকাণ্ড "নর-রামায়ণ" মহোপন্যাসের দ্বিতীয়কাণ্ড

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(মহালয়া, সন ১৩৪০ সাল)

প্রকাশক
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৭১ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
"এলম্ প্রেস"
৬৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা দশ আনা

উপহার



পূর্ব্ব-কথা

——:0:——

গলার কাঁটা সপ্তকাণ্ড "নর-রামায়ণ" মহোপন্যাসের দ্বিতীয় কাণ্ড। কিন্তু ইহাকে একখানি স্বতন্ত্র উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাঠক-পাঠিকাগণ এই উপন্যাসখানি পড়িবার পূর্ব্বে ইহার প্রথমকাণ্ড পড়িয়া লইলে, ইহাতে অধিকতর স্বাদ পাইবেন।

'স্কটিশচার্চ-কলেজে' অধ্যাপনা করিবার সময় বিদেশীয় দীর্ঘ উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া ঐরূপ একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখিবার কল্পনা মনে উদিত হয়, এবং আমার কয়েকজন অধ্যাপক-সহযোগী আমাকে ইহাতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাই এই বিরাট প্রচেষ্টায় ব্রতী হইলাম।

গ্রন্থোল্লিখিত পল্লীগ্রামের ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহার নাগরিকগণের নিকট নূতন ও অদ্ভুত বোধ হইতে পারে, এজন্য আমি দায়ী।

মহালয়া, সন ১৩৪০ সাল।
পোঃ উলপুর, জিলা, ফরিদপুর। } গ্রন্থকার।

স্মৃতি-লিপি

রাজেন !

তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে বোধহয় উপন্যাস নাই, সমস্তই বাস্তব। তোমার 'মনা' সেই সত্য-প্রতিষ্ঠানে একখানি কাল্পনিক কিছু পাঠাইল। ভাইটি ! গ্রহণ করিও। —

মনা।

গলার কাঁটা

এক

সৎকার শেষ করিয়া আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ কার্ত্তিকের না-আসা-সংবাদ দিলে গৃহমধ্য যেন হঠাৎ স্তব্ধ হইল; নূতন করিয়া আরম্ভ-করা-কান্না যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে উপিয়া গেল। হিন্দুশাস্ত্রে দেহীর অন্তিম বিদায়ের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া, নিভাইয়া, ধুইয়া, নিংড়াইয়া—যাহা কিছু অন্তনিষ্কৃতির ভাষা প্রয়োগ করিয়া আসার নামকে বলে সৎকার,—সৎকার্য্য, যেন ইহা অপেক্ষা সত্য, শাশ্বত, শ্রেষ্ঠ, শুভ বস্তু আর নাই। এ জীবনে বাঁচিয়া থাকাটাই কি তাহা হইলে এই বিশেষণগুলির বিপরীত দিক? মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর-পল হইতে যে এই রক্তমাংসের জন্য এত যত্ন, এত আদর, এত ভাবনা, এত ঔৎসুক্য এবং তাহার তো কোনও মতেই নিষ্কৃতি নাই যে পর্য্যন্ত না শেষ বায়ু নির্গত হয়, তবে এ সমস্ত কি বাস্তবিকই অসৎকার? কিন্তু আমার তো ক্ষণকালের জন্যও বিন্দুবাসনা মনে জাগে না, এই নেহাৎ ছেঁদো

বলিয়া মনে করা দেহ ছাড়িয়া যাই। বরং মনে হয়, বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত বিমান পাইব, আরও কত সাধিকা দেখিব, আরও কত রহস্যময় চরিত্র এ জীবনে দেখিয়া নয়নের সার্থকধর্ম্ম প্রতিপালন করিব। কি চমৎকার এই বিশ্ব! কি মধুর ইহার অধিবাসী। অতি প্রত্যুষে যখন দুর্গানাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করি, মনে হয় কি গরিমময় সূর্য্যোদয়। দিনমণি জবাকুসুমের ন্যায় উদিত হইলেন, আর ধীরে তাঁহার মনোরম লালিমা ছাড়িয়া আকাশটি বেড়িয়া ভাস্বর জ্যোতিঃপুঞ্জে সমস্ত মেদিনী ছাপাইয়া পুনরায় আবার তাহার রক্তাম্বর পরিধান করিলেন। এইরূপে তাহার জীবন। বালসূর্য্যের কপটতা নাই, মধ্যাহ্নরবির বৈচিত্র্য আছে, সায়ন্তপনের মাধুরী অসীম। মানুষেরও তো তাই।

এই তো বিমানের জীবন দেখিলাম। আরও কত দেখিতে হইবে কে জানে? কেন তাহার মাধুরীময় অন্ত হইল? তাহার চরম শাস্তি সৎকারে হইল নাকি? এত যন্ত্রণাময় জীবন কাহার আছে? কে এত কষ্ট পোহাইয়াছে; দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া অদগ্ধজীবন নহে কি? বাল্যকালের তাহার ইতিহাস কি ছিল? সে একটি সুন্দর বালক ছিল, তাহার ফুটফুটে রং ছিল, ধবধবে চেহারা ছিল, চরিত্রও কেমন অরুণ ছিল, শিক্ষাও আদর্শময় ছিল। কিন্তু এরূপ হইল কেন? কাহার বুদ্ধি? কে এরূপ তাহার পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছে? যদি বলি সে-ই তাহার কর্ত্তা, তবে তাহার কর্ত্তৃত্ব

কোথায়? তাহার মালিক সে যদি নিজে হইত, তবে সে রহিল না কেন? মরিল কেন? অপূর্ণ বাসনা, অসমস্ত ক্ষোভ বুকে করিয়া যাহা না তাহা লইয়া সে এত পীড়াপীড়ি করিল কেন? এবং শেষ রক্ষাও তো করিতে পারিল না। কে যেন আসিয়া ছিনাইয়া মচকাইয়া দুমড়াইয়া তাহাকে ঠুঁটো জগন্নাথ করিয়া রাখিয়া তাহার বুকের উপর দিয়া যাত্রীভরা ট্রেন চালাইয়া গেল। বিমান তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? হে সেই ট্রেন চালাইবার চালক! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার ভক্তি-আনত-হৃদয়ে জানাইতেছি। এমন সাধের সেই যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়া দিও না। সে বাগানে যেন আর কেউ না আসে মাত্র পাখীতে আসিয়া মধুর কলরব করিয়া সকলকে সজাগ করিয়া তোলে, বিশ্বনিয়ন্তার—তোমারই গান গায়, তোমারই বিভূতি জগৎকে জানায়। আমিও সেই তানে লয় দিয়া এ বিষদিগ্ধ জীবনের অবসান যেন করিতে পারি। এই শুধু আকিঞ্চন।

বিমানকে শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পর ইন্দুমতী ও সাধিকা নেহাৎ আপনার জন মায়া ত্যাগ করিয়া গেলে লোকে যেমন কাঁদে, তেমনই কাঁদিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর শোক যেন পুত্রশোকের মতই হইয়াছিল। সেই হাউহাউ করিয়া কান্না, সেই আর্ত্তনাদ, সেই বুকে মুখে চাপড়ান, তাহা বাস্তবিকই অসামান্য হইয়াছিল—এমন কি ইন্দুমতী যেন চিররুগ্না থাকিয়াও সেই কান্নার জন্য শক্তি

সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে যেন তাঁহাকে একটুও বিবশা হইতে হইয়াছিল না। তিনি যেন শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রাতুরা বোধ করিতেছিলেন। সাধিকার আর কি কাজ তখন? সে তো বিজ্ঞের মত সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ তাহাকে তো মাতাকে ঠেকাইতে হইবে, আর দাহ করিবার যাবতীয় জিনিস—পাঁচটা কড়ি, পিণ্ডের কিছু আতপতণ্ডুল, একটা পৈতা, একটু তেল বাটিতে করিয়া, দুইটি সলিতা ও ছেড়া নেকড়া ছিড়িয়া পাকাইয়া দিতে হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। হায়! সেই 'আদরের ময়না'! কেন তোমার এই জ্বালা? সেই প্রিয়জনের বিদায় উপহার। এত আহ্লাদ, এত ঢলঢল, তাই কিনা আজ কি! উঃ! সাধিকা তাই ভূতের মত কাজ করিতেছে আর নীরব অঞ্চলে চোখ মুছিতেছে। সে যে কি চোখ মোছা, তাহা কি বিমান দেখিয়াছিল! বিমানের কাণে কি সেই জলসিক্ত নাসিকার শব্দ পৌছাইয়াছিল! না, বোধ হয় নিশ্চয়ই না। যদি তাহাই হইত, তবে বিমানদা কিছুতেই তাহার আদরের লুকোচুরি-ডাক ময়নার অশ্রু মুছিয়া দিতে কত অশ্রু নিজেই ফেলিত, আর তেতলা হইতে দুপদাপ করিয়া কলঘরে কাঁদিতে সুরু-করা-সাধিকার জন্য নামিয়া আসিত এবং বলিত—'ময়না, আমার কি এই-ই দেখতে বাসা করে তোমাদের নিয়ে থাকা? ময়না, লক্ষ্মী আমার, কেঁদো না। উঠে তেতলায় চল।'

বিমানের এ বাসায়, এ যাবৎ এই যত দিন বাসা করা হইয়াছিল, কেহই পাড়ার আসে নাই। কারণ বিমান উহারা বাসাড়ে, কলিকাতার বাসিন্দারা সাধারণতঃ ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় করে না। অধিকন্তু বিমানচন্দ্র ঐ পাড়ার মধ্যে একটু স্বতন্ত্রভাবেই থাকিত। সে শিক্ষিত, অতি শিক্ষিত ছিল, তাহার সমকক্ষ লোক ঐ পল্লীতে বিশেষ ছিল না। সুতরাং ভাবও কাহারও সঙ্গে মোটেই হয় নাই। তবে সবাই জানিত, ঐ ছয় নম্বর বাড়ীতে এক জন বড় প্রোফেসর থাকেন। সবাই তাই ন্যায্য সম্মান বিমানকে দিত। বিমানও উদাসীন থাকিত। কাহারও কোনও ব্যাপারে বা পাড়ার কোনও কোঁচলে সে রহিত না। কিন্তু বিমানচন্দ্রের ডাক পড়িত তখন, যখন ঐ পল্লীতে বৎসরে তিন বার বারোয়ারী পূজা হইত। ৺কালীপূজা, ৺সরস্বতী পূজা ও ৺শীতলা পূজার জন্য যখন চাঁদা আদায় করিতে পাড়ার ছেলেরা মাতিয়া উঠিত তখন বিমানচন্দ্র নিজেই উদ্‌যুক্ত হইয়া আদায়কারীদের ডাকিয়া তাহাদের আশাতীত চাঁদা দশটি টাকার একখানি নোট দিয়া দিতেন, ইহাতে পাড়ার তরুণরা, কিশোররা বিমানচন্দ্রকে চাঁদা আদায়ের না-সময়েও সসম্ভ্রম নমস্কার করিত ও নেপথ্যে বলিত—মস্ত বড় প্রোফেসর ইনি।

আজ কিন্তু এ বাসায় লোক ধরে না। চির অপরিচিত ঐ বাসার সিঁড়িতে যাইবার গলিটি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে

গলার কাঁটা

দোতলার ইন্দুমতীর কক্ষ পর্য্যন্ত নানা বর্ণের লোক নিথরপ্রাণে মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে রা-টি নাই। শুধু এ ওর পানে তাকাইয়া চোখেই বলিতেছে—সেই মস্ত বড় প্রোফেসরটি 'পক্ষে' মারা গেছেন। কি চমৎকার লোক ছিলেন! যেন রূপের রাজা। প্রাণটাও মস্ত বড় ছিল, পাড়ার একটা বল ছিল।

শুধু দর্শনের সহানুভূতি দেখাইয়া অনেক লোক আসিল, গেল, কারণ এ কলিকাতা সহর, নিষ্কর্ম্মা লোক এখানে ক্বচিৎ। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ইন্দুমতীর পার্শ্বে যে কয়েকজন বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, সধবা বিধবা স্ত্রী উবু হইয়া, মুখে হাত দিয়া, সময় সময় সমদুঃখে দুঃখিনী সাজিয়া ইন্দুমতীকে শ্মশান বৈরাগ্যের বাঁধা-গৎ আওড়াইতে ছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ বাড়ীওয়ালার সধবা পত্নী একজন ও ছয় নম্বর বাড়ীর একটি ভাড়াটিয়ার বালবিধবা কন্যা অন্যজন। তাঁহারা সেই যে আসিয়াছিলেন আর যান নাই, অথবা বিশেষ কিছু কথাও এ যাবৎ বলেন নাই। বাড়ীওয়ালার বধূ হঠাৎ এই কান্নাকাটি শুনিয়া এবং তাহাদেরই একজন ভাড়াটিয়ার বিপদ জানিয়া অবিলম্বে নিজেই হাটুপাটু করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইন্দুমতীর সঙ্গে তাঁহার জানালায় জানালায়—অর্থাৎ বাড়ীওয়ালার বাড়ীর দ্বিতলস্থিত গবাক্ষের মধ্য দিয়া ও বিমানের বাড়ীর তেতলার সিঁড়ির ফুকর দিয়া চেনা, পরিচয়, ভাব পূর্ব্বে হইয়াছিল। উভয়ের প্রায়ই আলাপ

হইত, কিন্তু একে অন্যকে কখনই সম্পূর্ণ দেখে নাই। মাত্র এ অন্যের আকটিদেশ, অন্যে এর আবক্ষঃস্থল দেখিয়াছে। এই দুইজনের মধ্যে এ যাবৎ যে আলাপ হইয়াছে, তাহা সেই একঘেঁয়ে মেয়েলি আলোচনা,—কে কি রকম আছে, কি রান্নাবান্না হইল ইত্যাদি; কিন্তু আজ দুইজনে বিশেষ পরিচিতা হইলেন এবং ভূপত্নী ইহাদের সম্যক পরিচয় পাইলেন।

ভাড়াটিয়ার বালবিধবা কন্যার নাম যে সুবর্ণ তাহা আমরা আজ জানিয়া ফেলিলাম ইহা হইতে, ভূম্যধিকারিণী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে কাণে কাণে বলিলেন—যাও সুবর্ণ, তুমি—আহা-হা!- ঐ পোড়াকপালীর যা না করলে নয় - তাই সাজিয়ে দাও। আ—হা—হা! কাঁচা বয়েস। তোমারই মতন ছাইকপালী। ঐ পোড়া ছাই তো সাজতে হবে। আ-হা-হা!

ইহা বলিয়া বাড়ীওয়ালী মাথার কাপড়টা একটু নামাইয়া নিজের পাকা-কাঁচায় মেশান চুলের মধ্য হইতে জাজ্জ্বল্যমান আয়তি চিহ্ন সিঁথির সিন্দুর দেখাইলেন; তাহাতে যেন স্বতঃই প্রকাশ পাইল - নারীজীবনের একমাত্র চরম গৌরব, নিতান্ত গর্ব্ব, অবিশ্রান্ত সৌভাগ্য, পাকাচুলে সিন্দুর পরা। এ যেন অবলার বল, স্বাধীনতা।

সুবর্ণও একটু মলিন হইল কিন্তু সে কোনওরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মনিবানীনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য উঠিয়া গেল ও সাধিকার

পানে যাইতে উদ্যতা হইল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহার পা যেন আর চলিল না।

সে মনে মনে ভাবিল, কেন আমি নিজের সাজে পরকে আহ্বান করিবার অগ্রদূত হই? মন্দ অবস্থায় প্ররোচিত করিবার পথে কেহই পরিপন্থী হইবে না বরং অনেক সহায়কই জোটে, কিন্তু উন্নত অবস্থায় তাহারা কোথায় থাকে কেহই খুঁজিয়া পায় না। আজ এই বিমূঢ়া তরুণীর মন্দভাগ্য এবং মন্দভাগ্যের আশ্রয়েই আমার আলাপ, ইহার পূর্ব্বে আমিও ইহাকে পরিচিতা করি নাই, এও আমাকে ধরা দেয় নাই, তবে আজ এ সহানুভূতির অন্তরালে কেন বিদ্বেষ জাগাই? অজ্ঞাতা হয় তো মনে করিবে ইহা সমদুঃখের দুঃখ জানান নহে, এ বাস্তব পরিহাস। সর্ব্বোপরি সুবর্ণের মনে একটা গভীর ভালবাসা সাধিকার প্রথম দর্শনেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইচ্ছা তাহার হইল, এখনই তাহাকে সমস্ত প্রাণের কথা বলিয়া ফেলে। তাহার সঙ্গে যেন প্রাক্তনের চেনা। সুবর্ণ তাই নিজেকে ধিক্কার দিল—কেন সে পূর্ব্বে এ বাড়ীমুখো হয় নাই। যদি হইত, তবে সে বাস্তবিকই এমন জিনিষ পাইত, যাহা নির্জ্জন হৃদয়ের একমাত্র কাম্য, অনাবিলতার সার বস্তু।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বাড়ী পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—

বেয়ান, কেঁদে আর কি হবে? যা গেছে, তা গেছে।

ইন্দুমতী নীরব থাকিলেন, পার্শ্বের ঘরে বধূমাতা যে ছিল, তাহা

তাহার চুড়ির নিক্কণেই বুঝা যাইতেছিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ বধূমাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

বউ মা! মিছরি ভিজিয়েছিলেন কি?

বধূমাতার মনটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে বাস্তবিকই ত্রস্তা হইয়া ঘর হইতে ঘোমটা দিয়া বাহির হইল এবং সুবর্ণের ও ভূপতীর নির্দ্দেশ মত যে মিছরির সরবৎ ভিজান হইয়াছিল, তাহা এতাবৎ মামাশ্বশুরকে দেওয়া হয় নাই, যদিও তিনি বিশেষ শ্রান্ত, সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও অপ্রস্তুত হইল। সাধিকা অবিলম্বে নিজের আঁচলেই কাঁচের গেলাসের মিছরিপানা ছাঁকিয়া অন্য একটি গ্লাসে বারকতক ঢালা-উবুড় করিয়া আনিয়া অতি সম্ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সম্মুখে মেঝেয় রাখিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা পাইয়াই একচুমুকে তাহা পান করিলেন। ইন্দুমতী শুধু ঘোমটার ফাঁকে ব্রহ্মাণ্ডনাথের চোখ মুখ লাল দেখিতে পাইলেন। সাধিকা আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল এইভাবে কাটিল।

ব্রহ্মাণ্ড বলিলেন—এমন ক্ষেপাটে নিয়ে পড়েছি! সব গের।

ইন্দুমতী কথা না বলিয়া পারিলেন না। ঘোমটা মাথায় করিয়াও বেশ ধীরে ধীরে শব্দ করিয়া বলিলেন—

কেন বেয়াই?

ব্রহ্মাণ্ড ঈষৎ ক্রোধপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—

বেয়ান! খাই দাই, তারপর বলবো। শ্মশান থেকে এসে কিছু খেতে হয়।

ইন্দুমতী তখন উঠিলেন এবং বেশই বয়স্থার মতন সিঁড়ির দিকে বাহির হইয়া গলার শব্দ করিয়া ময়নাকে ডাকিলেন।

ময়নাও মায়ের বাহির হইবার শব্দে মায়ের কাছে আসিয়া আগেই জানাইল—

ঠাকুর তো রান্না শেষ করে চলে গেচে।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি রেঁধেছে?

সাধিকা জবাব দিল—

রেঁধেচে যা, তা দিয়ে কি করে ভাত দেওয়া যাবে?

ইন্দুমতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

সব বেগোছালো! কার থা, কে দেখে!

সাধিকা মাতাকে বলিল—

তা যাক। বল, কি করি।

মাতা চুপ করিয়া রহিলেন।

সাধিকা পুনরায় বলিল - বল।

মাতা বলিলেন—একটু রাবড়ি, মিষ্টি এনে দেওয়া যাক। কাকে দিয়েই বা আনি!

সাধিকা বলিল—মা! বাড়ীওয়ালার ঝিটাকে পেলে হত।

মাতা সোৎসাহে বলিলেন—

চুপ চুপ করে বার-দরজায় উঁকি মেরে দেখ—সে আছে কিনা।
এখন পর্য্যন্ত সে কি আছে? নাই, চলে গেছে, রাত এখন বারটা।

সাধিকা মায়ের কথামত অতি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল। অন্ধকারে যাইতে মেয়ের ভয় করিতে পারে, বিশেষতঃ ঐ দিনে, মাতা তাই মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া কিছু নামিলেন। সাধিকা সরাসরি হাতড়াইতে হাতড়াইতে বার দরজায় ঠুক করিয়া ঘা খাইতেই বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তখন সাধিকা বিব্রতা হইয়া পড়িল। সে মনে করিল—তাহার স্বামী বোধ হয় পিছনে আসিতেছিলেন, তাই এই বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কিন্তু তাহা হইলেও সাধিকার দরজা খুলিবার সাহস হইল না। সে মনে করিল যদি তাহা না হয়, তাই কন্যা মাতার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

মা! কে যেন কড়া নাড়চে।

মাতা তখন অন্ধকারে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মেয়ের কথায় ও নিজে ঐ ঝনঝনি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন কিন্তু কি করিবেন সহসা বুঝিয়া পাইলেন না।

সাধিকা ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং ভাবে যেন প্রকাশ করিতেছিল সে নিজেই ঐ দরজা খুলিবে। ইন্দুমতী বলিল—

যে জোর কড়ানাড়া—কার্ত্তিক বুঝি এসেচে।

সাধিকা তখন জোর পাইল কিন্তু মাতার সম্মুখে স্বামীকে কি করিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, তাই সঙ্কুচিতা হইতেছিল। ইন্দুমতী বলিল—

দাঁড়া, আমিই খুলে দিচ্ছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা মাতা গুটিগুটি করিয়া বার দরজা খুলিতেই দেখিতে পাইল, এ তো কার্ত্তিক নহে।

সাধিকা, যে উদগ্রীব নয়নে দরজার বাহিরের আলোর প্রত্যাশা করিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, তাহার স্বামী আসিবে, দেখিল—কই স্বামী! এ যে তাহার নবপরিচিতা স্থবর্ণ! পরিধানে একখানি ধবধবে থানের কাপড়। আঁচলে একছড়া চাবি। আঁচলখানি মাথার উপরে ঈষৎ ঘোমটার মত। গায়ে একটি ফর্সা সেমিজ, ফুটফুটে রঙে বেশ মানাইয়াছে। হাতে একটা বড় গামলা থালা দিয়ে ঢাকনা দেওয়া। ইন্দুমতীকে দরজায় দেখিয়াই স্থবর্ণ বলিল—

ওকি কাকীমা! আপনি নিজেই সদর দরজা খুলতে এসেছেন ?

ইন্দুমতী বলিলেন—

কি করি মা? মেয়ের তো ভয় বেশী। এখানে তো কোন দিন নামোন, ঐ যেদিন মাত্র এ বাসায় ঢুকেচে। তবে দু এক দিন যে থিয়েটার—বায়স্কোপে যেতে নামতে হয়েছিল, সে তো বিমানের

সাথেই। আজ বাছাকে বিদায় দিয়েচি, আজই দেখ, বার দরজায় এসেচি, এর পরে কি অদেষ্টে আছে তা ভগবান জানেন। কি মা! তোমার হাতে কি? এত রাত্রে?

সুবর্ণ বামুনের মেয়ে। তাহার পিতার ভট্টাচার্য্য উপাধি। সে বলিল— কাকীমা! তখন আমি আমাদের ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই মা আমায় জিজ্ঞেসা কর্ল্লে—খুকি! ভালমানষেরা শ্মশান থেকে ফিরে এসে কি খাবেন তা তুই জেনে এসেছিস? আমি বল্লাম, মা, তা তো জানিনা। মা তখন আমায় বললেন, আহা! তা হলে তাদের খাওয়া হবেনা। আজ কি ওবাড়ীর ঠাকুর আসবে? তা আসে আসুক, না আসে না আসুক, তুই নিজে গিয়ে কাপড় ছেড়ে রান্না করে ওঁদের দিয়ে আয়, নইলে কারুরও খাওয়া হবে না। কাকীমা! আমি তাই অতি শীগগির এই রান্না শেষ করেচি। মা এই দরজা পানে আমাদের ছাত থেকে চেয়েছিলেন, ওঁরা আসেন কিনা। তা শেষে ওঁদের ঢুকতে দেখে মা আমায় বল্লেন—যা খুকী! তুই এখন ভাত বেড়ে নিয়ে যা। কাকীমা! আমি তাই নিয়ে এসেচি, চলুন, উপরে যাই। এই বলিয়া তাঁহারা তিন জনে উপরে গেলেন। ইন্দুমতীর নির্দ্দেশ মত সুবর্ণও পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যেখানে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানেই শ্রমের ঘুম ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং অভ্যাস মত তারস্বরে নাক ডাকিতে লাগিলেন।

ভাত বাড়া হইবার পর সুবর্ণ বলিল—কাকীমা! তাঐ মশায় ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে কে ডাকবে? সুবর্ণ কাকীমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অতি যত্নে ঠাঁই করিয়া দিয়া বলিল 'কাকীমা আমিই ডাক দিচ্ছি।' এই বলিয়া সুবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডনাথের কাছে গিয়া তাঐ মশায়, তাঐ মশায় বলিয়া ডাক দিল। তাঐ মহাশয় ধড়ফড়িয়া উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া আহারের আসনে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং খাইতে খাইতে বলিলেন, বেয়ান! কার্ত্তিকটা তো আর এলোনা। ঘাটে শব নিয়ে পৌঁছলে, সে এই বলে চলে গেল যে সে তার বৌদি আর দিদির কাছে ক্ষমা চাইতে চলল, তাঁরাও যদি বিমানের মত চলে যায়। মহামুস্কিল!

ব্রহ্মাণ্ডনাথ এই বলিয়া নীরব হইলেন। ইন্দুমতীর দৃষ্টিতে আবার ঘনায়মান অন্ধকার ভাসিয়া উঠিল। তিনি শুধু এই মাত্র বলিলেন—কোথায় গেল কার্ত্তিক? সে কি শবদাহ কর্ব্বার সময় ছিল না? পরে আসবে না?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—পরে আর কখন আসবে? এখন যে রাত প্রায় একটা আর গিয়েছে কখন—সেই ৭।৮ ঘণ্টা আগে। ওটাকে আবার খুঁজতে হবে।

প্রত্যূষে উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ড নাথ শৌচাদি শেষ করিয়া বলিলেন—বউমা! আজ আমার হাইকোর্টে মামলা। আমি এখন উকিলের বাড়ী যাবো। সেখান থেকে কার্ত্তিকের খোঁজ করে বাড়ী যাবো। যাত্রাটা পরিবর্ত্তনের দরকার পড়েচে। মামলায় তো হারবো নিশ্চয়ই। মামলায় হারলে এ মুখ এখানেও দেখান যাবে না আর দেশেও নেওয়া চলবে না। যে গেরতে পড়েচি। আমাকে একটা পান দিন।

বধূমাতা পান সাজিয়া আনিয়া মামাশ্বশুরকে পানের ডিবাটি হাতে দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিল। নিকটেই বৈবাহিকা ছিলেন, তিনি মেয়ের কান্নায় সুর মিশাইলেন। সাধিকা বলিল—

বড়মামা!

সাধিকা জীবনে এই প্রথম ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত কথা বলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—বড়মামা! দিন ভালই থাক, আর মন্দই থাক, আপনার যে যাত্রাই হোক, আমাকে যাত্রাপুরে নিয়ে যেতেই হবে।

বড়মামা বলিলেন--

বেয়ান কোথায় থাকবেন?

সাধিকা জবাব দিল—

মাকে দিদিমার কাছে কাশীতে আপনি পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

সে তো এখন হবেনা।

সাধিকা উত্তর করিল—

তবে কখন ?

ব্রহ্মাণ্ড বলিলেন—

মামলাটা হয়ে যাক।

সাধিকা জবাব দিল—

তবে আমরা নিরাশ্রয় থাকবো ? এই ভাড়াটে বাড়ী। কে দেখে শোনে ?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সুর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—

যিনি এনেচেন, তিনিই দেখবেন। যাই, আমার দেরি হয়ে গেল।

এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড বৈবাহিকের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—

আমি তবে আসি বেয়ান !

বৈবাহিক চলিয়া গেলেন। এই এখন প্রকৃত এ-বাড়ীর স্বরূপ বাহির হইল। বিমান যে সত্যই নাই, এ অনুভূতি এযাবৎ ভাল করিয়া কেহ বুঝিতে পারে নাই। কারণ বিমানের বিয়োগের পরে এযাবৎ ইঁহারা পদস্থ আত্মীয়, যিনি ইহাদের সম্বল হইবেন, তাঁহারই যত্ন-আত্মি যাহাতে ত্রুটিবিহীন হয় এজন্য চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এখন সে সহায় সরিয়া গেলেন, হয়ত পরে আসিবেন, কিন্তু এই

পরের মধ্যে কে এখন এই দুইটি প্রাণীর তত্ত্বাবধান করে ? একটি বৃদ্ধা, একটি যুবতী। উভয়ই পরমুখাপেক্ষিণী। কে কাহাকে দেখে ? যদি এই ইটের পাঁজাটা মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে এই দুইজনের যে রাস্তাও সম্বল নাই। ঐ ইট কাঠের নীচে পড়িয়াই যে মরিতে হইবে ; কেহ তাঁহাদের টানিয়াও ফেলিবেনা। সাধিকার সেই বিবাহ-রাত্রির গৃহদাহের কথা মনে পড়িল। সেদিনটা-তাহার যেরূপ ভয়াবহ মনে হইয়াছিল, আজিও তাহা হইল। বাস্তবিকই এই দুইটি বস্তু সমানই মনের উপর ছাপ মারিয়া দেয়। গৃহদাহ আর দেহদাহ। দেহটা ও তো একটা গৃহের ন্যায় আবরণ মাত্র। আজ বিমানের দেহদাহ হইয়াছে। তারপর স্বামী ! তাহার ও নাকি খোঁজ নাই। সাধিকা আর ভাবিতে ভয় পাইল। সে দ্রুত কাপড়-চোপড় সংযত করিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল। ইন্দুমতীও কলতলা গেলেন। দিন যেমন চলিতোছিল, তেমনই চলিল। ঠাকুর আসিয়া বলিল– দিদিমনি ! আপনি কেন কাজ কচ্ছেন ?

দুই

সে দিন শনিবার। কলিকাতার চাকুরেদের আনন্দের দিন ; স্কুল কলেজের ছাত্রদের ও বটে। সারা সপ্তাহে ছয়টি দিন হাড়ভাঙ্গা

পরিশ্রম করিয়া শনিবারের বৈকাল, রাত্রি ও রবিবারের দিনটি ছুটি পাইয়া সকলেই যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচে। তবে রবিবার সম্পূর্ণ ছুটি থাকিলেও দিনটি বিশেষ আরামপ্রদ নহে, কারণ চিন্তা, রাত্রি প্রভাত হইলেই আবার 'ছোট'। আর গোটা সপ্তাহের পুঞ্জীভূত কাজ--যেমন এর তার সঙ্গে দেখা করা ইত্যাদি ঐ রবিবারের জন্য জমিয়া থাকে, তাই কেহ রবিবারে তেমন অবসর পায় না, শনি-বারেই সকলে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে।

রমেন বহু দিন হইতেই ভাবিতেছে বিমানের সঙ্গে একবার দেখা করে। ঐ সেদিন সে বিমানের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, আর সেখানে সে যায় নাই, কারণ বিশেষ অবসর পায় নাই। বিমান যদিও বলিয়া ছিল, সে তাহাদের হেদুয়া-সন্নিহিত মানিকতলার মেসে একবার আসিবে, তথাপি সে আসে নাই। রমেন তাই শনিবার সকাল হইতে স্থির করিয়াছে আজ বৈকালে সে একবার বিমানচন্দ্রের বন্ধুত্ব অবশ্য ঝালাইতে আসিবে ও বিশেষতঃ 'ধ্যানের-ছবির' সঙ্গে 'সেকেণ্ড টাইম' একটু 'ইনটার-ভিউ' করিবে। সে মনে করিল—'বেড়ে আছে বিমান! এমন হলে তো সংসারে আমি আর কিছু চাইতাম না। কিসের শালার ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন? 'রোমান্স' না থাকলে কি জীবন? ও তো শেয়াল কুকুরের মত কাল কাটানো। টাকা রোজগার কর, খাও দাও আর স্ফূর্তি কর।' সে মনে মনে বলিল—বিয়ে

করার মত একঘেঁয়ে, গতানুগতিক জীবন আর নাই। হাতে পায়ে শেঁকল সেধে পরা, শেষে জড়িয়ে লোটাপটি। এ বলে ওরে দেখ, ও বলে এরে দেখ। অশান্তি, অশান্তি, চির অশান্তি। আর এ ফুলে ফুলে মধু খেলাম, জঞ্জাল পোয়াতে হল না। সর্ব্বোপরি চিরকাল এক জনকে নিয়ে থাকাটা কি একটা 'ড্রাজারি' নয়? থোড় বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোড়। বিমান! তুমিই বুদ্ধিমান ছেলে বাবা! তবে ও সব বুজরুকি রেখে দাও। 'প্লেটনিক লভ'! হ্যা! ঢের দেখেছি। বাবা! ও সব ডুবে ডুবে জলখাওয়া কি আমরা বুঝি না? হও বাছা! তুমি লেখা পড়ায় বিদ্বান্। কালিদাস কি করেছিল?

রমেন সে-দিন আফিস হইতে খুবই সকালে মেসে পৌঁছিয়াছিল এবং আসিয়াই পায়খানায় গিয়া হাত পা মুখ ধুইয়া, সেভ-করা মুখ খানা সাবান দিয়া বেশ করিয়া ঘষিয়া আসিয়া চুলগুলি ঝাঁড়া এক ঘণ্টা ধরিয়া মনের মতন করিয়া পার্টি করিল, যেন কিছুতেই সাজান হয় না;—একবার মোটা চিরুণী, একবার সরু চিরুণী, একবার ব্রুস দিয়া চুল বেচারীর প্রাণান্ত করিল। শেষে কোনও মতে মাথাকে রেহাই দিয়া হাড়জাগান, ভিতরঢুকান, উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণের মুখ খানি লইয়া ব্যস্ত হইল। ঐ সেই কথাশিল্পীর ভাষায় যাহাকে বলে, অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যের অন্ধকারে মেশা ইন্দুরের চক্ষু দুইটি যেরূপ বাহির হইতে দেখায় সেই রূপ চোখ

ভুইটা লইয়া রমেন আয়নার পানে বার বারই তাকাইয়া নিজের রূপের রং স্নো দিয়া মনভুলান করিতে বসিল কিন্তু তাহার বেয়াদব দাঁত চারিটি তাহার মুখে যে বিগুমান আছে তাহা প্রমাণ না করিয়া পারিল না। তারপর রমেনের ভদ্রলোক-রজকের কাঁচা জড়ি পেড়ে কাপড়, ড্রয়ার, গেঞ্জি-ফতুয়া, শালকর-পরিষ্কৃত মটকার পাঞ্জাবী গোছ-গাছ করিয়া পরিবার পালা পড়িল। চকচকে জড়ির জুতা, যাহাকে নাগড়াই বলে তাহা সে পায়ে ঢুকাইল। সর্ব্বশেষে আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চশমা জোড়া পরিতে লাগিল, যেন নাকটি ও চশমাটা ভাসুর-ভাদ্রবধূ—এ ওকে ছুঁইতে চাহেনা।

রমেন যখন বিমানের বাসার সদর দরজায় আসিল তখন সে নিজ হাতের সোণার কব্জি-ঘাড়র পানে তাকাইয়া দেখিল,—সাড়ে পাঁচটা। রমেন মনে মনে বলিল, ওঃ! এত দেরি হয়ে গেচে! তবে তো বিমান বেরিয়ে গেচে। সে তবুও বার-দরজার কড়া জোরে নাড়িতে লাগিল। কিন্তু বহুকাল কড়া নাড়া হইলেও ভিতর হইতে কোনও শব্দ হইল না যে দরজা খোলা হইতেছে। রমেন আবার ডাকাডাকি হাকাহাকি করিতে লাগিল। এবং শেষে বিশেষ মন খারাপ করিয়া ভাবিল—'ওঃ! কার মুখ দেখে মেস থেকে রওনা হয়েছিলাম? হ্যাঁ, সেই অসিতটার শাপ ফলে গেচে। ষ্টুপীড বলেছিল তাকে নিয়ে আসতে। সে বেটাচ্ছেলেই তাহলে দীর্ঘ নিঃশ্বেস ফেলেচে।'

রমেন ইহা বলিয়া পুনরায় আরও জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। ও বাবা! কড়া নাড়ার এমন শব্দ হইল যে ঐ ছোট্ট গলিটার এ পার হইতে ওপার পর্য্যন্ত যত বাড়ী আছে, তাহার প্রায় প্রতি বাড়ীরই মেয়েরা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল যে কে এমন সব্বনেশে-ডাক ডাকিতেছে। তাহারা বলিল—'ও মিনসে কি রাত দুপুর ভেবেচে, না ইতর মেয়েদের বাড়ী পেয়েচে, যে এত হাকাহাকি কচ্চে? অনতিকাল মধ্যে পার্শ্বস্থিত বাড়ী হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া পাথরে বাঁধান গলি দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে?

রমেন অবাক হইয়া জবাব দিল—আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, এবাড়ীর লোকেরা কি দিন দুপুরে ঘুমুচ্ছে, না মরে আছে, নৈলে ভেতর থেকে খিল দেওয়া আছে কিন্তু ভেতরের লোকে সাড়া দেয় না—কেউ আছে বলে!

তরুণী আগন্তুকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কাকে চান?

রমেন উত্তর করিল—চাই প্রোফেসর সাহেবকে। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশুনা আছে—এক রকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

মহিলা ভদ্রলোকটির মুখে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া শুনিয়া কহিল—অপেক্ষা করুন, আমি ডেকে দিচ্ছি, আপনি একটু সরে দাঁড়ান।

তরুণীর কথায় রমেন সহসা ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল। তখন

মহিলাটি ঐ দরজায় আস্তে আস্তে টোঁকা দিয়া বলিল—কাকীমা! দরজাটা খুলুন তো।

কাকীমা ও সাধিকা, যাঁহারা বহুকালই নীচে নামিয়া সদর দরজার গায়ে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ফাঁক দিয়া রমেনকে চিনিয়া দরজা না খুলিবারই মতলব করিয়াছিলেন ও ভাবিয়াছিলেন, বিমানের বন্ধুটি কিছুকাল ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু শেষে সুবর্ণের আস্তে-কথা তাঁহারা শুনিতে পাইয়া ঠিক করিয়া দরজা খুলিলেন এবং সুবর্ণ তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল - আসুন।

ভদ্রলোক ভিতরে আসিলেন এবং সম্মুখেই কাকীমাকে দেখিয়া লোটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কাকীমা। এত সকালেই ঘুম? পাড়ার লোকে এসে দরজা খোলালে নৈলে তো আমি ফিরেই যেতাম। রমেন সুবর্ণের দিকে তাকাইয়া বলিল—মাপ কর্বেন, আপনাকে কষ্ট দিইচি, আপনার দয়ায় আশ্রয় পেয়েচি।

রমেন পুনরায় কাকীমার দিক ফিরিয়া এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিল এবং পরিশেষে সে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিল—কাকীমার শরীর এই কয়েক মাসে অর্দ্ধেক ও নাই। কাকীমা এ সমস্তই সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল—কাকীমা! বিমান বেরিয়ে গেচে?

সে কাকীমার জবাব না শুনিয়াই বলিল, তা যাক, 'ওয়েট' করি, চলুন, উপরে চলুন। এই বলিয়া সে যেন নিজেই কাকীমাকে একরূপ টানিয়া লইয়া উপরে গেল আর বলিতে লাগিল—কাকীমা! বড় দুঃখ মনে রয়ে গেচে, কাকার ছি-চরণ দেখা বরাতে জুঠলো না। অদেষ্ট! অদেষ্ট!

ইন্দুমতী এতাবৎ মোটেই কথা বলেন নাই, শুধু রমেনের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলেন।

সুবর্ণ আগন্তুককে আত্মীয়দের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে আসিয়াছিল এবং একপায়ে দুইপায়ে যেমন আসিয়াছিল তেমন চলিয়া গেল।

মাতা ও রমেন বাবু ঘরে ঢুকিয়াছে এবং রমেন বাবু একেবারে মায়ের বিছানায় সটান শুইয়া পড়িয়াছে—মাত্র জুতা-পরা পা দুখানা তক্তপোষের নীচে আছে ইহা উঁকি মারিয়া দেখিয়া সাধিকা নিজে গিয়া সদর দরজার খিল দিয়া আসিল কারণ কিছুদিন ধরিয়া এরূপই স্বভাব তাহাদের হইয়াছিল। বাহিরের দরজা কখনই তাহারা খোলা রাখিত না।

রমেন শুইয়া পড়িয়া কাকীমাকে বলিল—কাকীমা! আজ আমাদের মেস বন্ধ। ঠাকুর বেটাচ্ছেলের অসুখ করেচে, আজ আসবে না, রান্না-বান্নাও হবে না। আজ আমি এখানে খাবো। এই বলিয়া সে ঝপ করিয়া উঠিয়া নিজের বুক-পকেটে হাত দিল

এবং চমকিয়া বলিল--য়্যাঃ! কেটে নিয়েচে নাকি? তিনখানা দশ টাকার নোট যে পকেটে রেখেছিলাম—তাইতো!

কাকীমা পকেট কাটার কথায় একটু চকিতা হইলেন ও এদিক ওদিক চাহিয়া তক্তপোষের নিম্নে তাকাইতেই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, রমেন-কথিত তিনখানা নোট মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—

এই যে তোমার টাকা রমেন।

রমেন বলিল—কাকীমা! পেয়েচেন? তাইতো, এখানে শুতে গিয়ে পড়ে গেচে। কাকীমা! আপনার কাছে ও এখন রেখে দিন, যাবার সময় দেবেন, নৈলে আবার যদি পড়ে যায়। কাকীমা! ময়না কোথায়? ঐ যে দুষ্টু-বুড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে! এস ময়না! এদিকে এস। বিমান এলে বলে দোবো—তুমি আমায় দেখে লুকোচ্ছ, এস। ও কি? আমি কি এ-বাড়ীর অচেনা? কাকীমা কি আমার পর? কাকীমা! ময়না ওরূপ কল্লে রমেন আর এ-বাড়ী মারাচ্ছে না, তা জানবেন। এস ময়না! এস, নৈলে নিশ্চয়ই বিমানকে বলে দোবো। ময়না তখন ঘরে ঢুকিয়া রমেন বাবুকে বলিল—

হাঁ, তাইই বলে দেবেন। বিমানদাকে বলে দেবেন, ময়না কাছে আসেনা।

এই বলিয়া সাধিকা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইন্দুমতীও ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

রমেন তখনও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা—কেন ইঁহারা কাঁদিয়া আকুল। সে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওকি ময়না? ওকি কাকীমা?

মাতা ও কন্যা উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়াছে। ইন্দুমতী সাধিকাকে বলিল—ময়না! সন্ধ্যে বাতি জ্বাল।

সাধিকা আর কাঁদিল না। সে উঠিল ও লক্ষ্মীর আসনের তেলের প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল। ধূপতিতে যে কয়েকখানা কাঠ-কয়লা ছিল তাহা দেশলাইয়ের কাটিতে ধরাইয়া ফুঁ ফুঁ করিতে লাগিল এবং কয়লাগুলি ধরিয়া গেলে কিছু ধূপ তাহাতে ছড়াইয়া দিল। ধূপের গন্ধে ঘর আমোদিত হইল, তখন সাধিকা শাঁখটি দরজার আঁড়ালে লইয়া গিয়া বাজাইল। রমেন অপলকনেত্রে ঐ লক্ষ্মীর আসনের পটের দিকে একভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার এত কথা ধূপ-ধুনোর গন্ধে মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রমেন বলিল—কাকীমা! আপনি বুদ্ধিমতী হয়ে এত অবুঝ হন কেন? ছি! ময়না! ওরূপ কর্ত্তে নাই। কাকা গিয়েছেন, বেশ গিয়েছেন, বুড়ো মানুষ, গঙ্গা লাভ হয়েচে। এজন্য কেঁদে কেন তাঁর মৃত আত্মাকে ব্যাকুল করা? কাঁদলে কি তিনি আসবেন? তা যদি হতো, আমরা সবাই মিলে নয় কেঁদে দেখতুম—কাকা আসেন কিনা। কাঁদাটা যে লোক দেখানো, এ ঠিক। দুঃখ থাকবে মনে মনে: আর কাকীমা! কাঁদাটা ফর্ম্মালিটিও বটে;

যেমন শুনেছি, আগেকার দিনে গ্রীসদেশে যদি কেউ মরত, তবে সেই মৃতের আত্মীয়েরা লোক ভাড়া করে এনে নাকি এক পসলা কাঁদিয়ে নিত। কাকীমা! কেউ মলে যদি প্রকৃত দুঃখই হয় তবে কেঁদে কেঁদে লোক না দেখিয়ে, সম্রাট সাহজাহানের মত মমতাজের শোকে চুল-দাড়ি পাকিয়ে ফেল না কেন ও জগৎগৌরব তাজমহল সৃষ্টি কর না কেন। তবে বুঝি শোক করা। আমার সাফ কথা। কই কাকীমা! বিমান যখন আসে আসুক, আমায় কিছু খেতে দিন, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ইন্দুমতী ও সাধিকা কোনও বিশেষ উচ্চ-বাচ্য না করাতে রমেন নিজেই বলিল—দাঁড়ান, কাকীমা! আমি নীচে থেকে একটু আসি। দেখবেন, যেন আবার ঘুমিয়ে না পড়েন, তা হলে আমার আবার সেই ঠাকরুণকে ডাকতে হবে।

রমেন এই বলিয়া নীচে দৌড়াইয়া নামিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিয়া এক লম্ফে যেন গলিটা পার হইয়া চিৎপুরের রাস্তায় পড়িয়া ওপারের একটা খাবারের দোকান হইতে মস্তবড় একটা চুপড়িতে করিয়া অনেক খাবার টাকা তিনেকের মত কিনিয়া আনিল এবং তরতর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিল। ইন্দুমতী ও সাধিকা আলো বেড়িয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। রমেন বলিল—ময়না! এস, খাই। কাকীমা! আমায় আগে কিছু দিন। ময়না! এক গ্লাস জল

খান তো। গরমও বড্ডো পড়েচে। উঃ! ঘেমে গেছি এটুকু আসতে।

কাকীমার হাত হইতে খাবার দুই একটি খাইয়া রমেন বলিল—নাঃ! আর না। নাড়ী তো এই কলকাতার জলে একেবারে মরে গেছে। বাড়ী থেকে বেরুলে আর কি খাওয়া থাকে? বা গুচ্ছের খেয়ে হজম কর্ত্তে পারি? ক্ষিদে তো না একটা উপসর্গ। খাইও তাই ক্ষিদের অসুদ—হোমিওপ্যাথিক ডোজে। কাকীমা! মেসের উড়ে-বিপ্রর হাতে খেয়ে খেয়ে এখন আর বাড়ী গিয়ে বা আপনাদের হাতে খেতে পারিনা। কাকীমা! সব ইন্দ্রিয়ই জয় করে এনেচি, সব ইন্দ্রিয়ই বশ মেনেচে—এই কেরাণী জীবনে আর মেস-হোষ্টেলের কল্যানে; এক পারিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে। কর্ণ এক ইন্দ্রিয়, তা আফিসে বড় বাবুর বকুনি শুনতে শুনতে এখন ইচ্ছা হয় না যে একটু ভাল কথা, কি ভাল গান বাজনা শুনি। জিহ্বা এক ইন্দ্রিয়, তা উৎকল-পাচকের পঞ্চকোল-পাচন খেতে খেতে, সাধ হয় না একটু ভাল জিনিষ মুখে দিই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু কাকীমা! চোখ দুটো বড় বেয়াদব, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। তাকানোই একটা রোগ। ভাল একখানা কাঁচা মুখ চোখে পড়লে, না তাকিয়ে পারিনা। আমি কাকীমা! বড় সরল। সব স্বীকার করি। তাতে আপনি যাই বলুন না কেন।

রমেন সেই রাত্রিতে আর মেসে ফিরিতে চাহিলনা। কাকীমা তো অবাক হইলেন। কিন্তু কোনও উপায়ই যে তাঁহার নাই। কাহাকে কি বলেন, তাহাই তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। এক সহায়ের মধ্যে সুবর্ণ। তাহার কাছেও কি এখন সমস্ত কথা বলা চলে? আর সমস্ত কথায় মেয়েকে টানিয়া আনা, না তাহাকে বিপদে ফেলা। তিনি সাধিকার বুদ্ধি ও সমস্ত সময় লইতেন না।

সাধিকা অতি যত্নে রমেন বাবুকে দুটি রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিল। রমেন বাবুও বিশেষ তৃপ্তির ভোজন করিয়া বলিয়াছিল—'ময়না, তোমার রান্না দু দিন পেটে গেলে, এ শুকনো ডালেও ফুল গজাবে। ময়না ইহাতে সন্তুষ্টই হইয়াছিল।

ইন্দুমতী একবার ভাবিলেন—এই তো সেই রমেন, যাহার পরিচয় তিনি বহু পূর্ব্ব হইতেই পাইতেছেন; তাহা জানিয়া শুনিয়া এই পুরীতে তিনি ইহাকে লইয়া কিরূপে রাত্রি বাস করেন? তাঁহার যে প্রথমেই ইচ্ছা ছিল রমেনকে বাড়ীতে না ঢুকিতে দেওয়া কিন্তু শেষে তাহাকে পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব চরিত্র তিনি তো ভুলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কারণ সে বিমানের বন্ধু, অন্তরঙ্গ-জন। তাহা হইলেও এখন যে তাঁহার মন মোটেই সরেনা—এক বাড়ীতে বয়স্থা মেয়ের গৃহে ইহাকে রাখা। তিনি বড়ই চিন্তাকুলা হইলেন।

ইত্যবসরে স্থবর্ণ আসিয়া কাকীমা বলিয়া ডাক দিল এবং অন্য দিনের তুলনায় অধিক লজ্জিতা হইয়া বলিল--কাকীমা! উনি খেয়েচেন ?

কাকীমা জবাব দিলেন- হ্যাঁ, খেয়েচেন। তবে স্থবর্ণ! তুমি এসেচো, ভালই হয়েচে। আমি মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আসবে না। আমি তাই ভাবছিলাম, তোমায় ডাকাবো।

স্থবর্ণ বলিল—না, কাকীমা! একটা সংবাদ না নিয়ে কি ঘুমুতে পারি ?

কাকীমা চুপ করিলেন।

স্থবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—কাকীমা! তবে আজ কি আমার এখানে থাকতে হবে ?

কাকীমা বলিলেন—হাঁ, থাকতে তো হবেই। এ কয়েকদিনে এমন অভ্যাস হয়েচে, তুমি না আসা পর্য্যন্ত যেন ছটফট করি ; আর হ্যারিকেনটি জ্বেলে দুজনায় মুখোমুখী হয়ে তোমার আসার অপেক্ষা করি।

স্থবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

কাকীমা, উনি আপনাদের কি রকম আত্মীয় ?

ইন্দুমতী বলিলেন—

বিমানের আপনার জন, তাইতে আমাদেরও বটে।

স্থবর্ণ কহিল—

তা হলে আমার তো ভারি লজ্জা করছে। তবে ভদ্রলোক বেশ ভাল। আলাপ ব্যবহার বেশ চমৎকার। আদব-কায়দাও বেশ জানেন। হবে না কেন? যে লোকের চেনা। হুঃ!

সুবর্ণ ইহা বলিয়া একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—উনি কি শুনেচেন খবরটা?

ইন্দুমতী বলিলেন—

হাঁ, শুনেচে, তাই রাতে আমাদের ফেলে যেতে চাইচে না। কিন্তু একরাত্রি আমাদের আগলিয়ে রাখলে কি হবে? বরং তাতে ভয় আরও বেড়ে যাবে। যাতে অভ্যস্ত হচ্ছি, তাই-ই ভাল। আমি সেজন্যই একে এখানে রাখতে ইচ্ছে কচ্ছি না। কিন্তু ঐ কি তাই শুনবে?

রমেন নৈশভোজনের পর প্রায় এক মাইল পাদচারণা করিত। তাই সে অভ্যাস মত তেতলার ছাদে পায়ে চলিতেছিল, যদিও এক মাইলের সমান হাটিতে ছাদে অনেকবার তাহাকে এদিক ওদিক যাইতে-আসিতে হইয়াছিল।

ঐ কাজ শেষ করিয়া রমেন নীচে আসিয়া কাকীমাকে বলিল—কাকীমা! আমি আপনার কোলের মধ্যেই শুয়ে থাকবো। ময়না পাশের ঘরে থাকবে।

সহসা রমেনের দৃষ্টি সুবর্ণের দিকে পড়িতেই রমেন বলিয়া উঠিল—এই যে, আপনি এখানে? আপনি বিমানের জায়গা অধিকার

করেচেন না কি? বেশ, থাকুন, রেতের বেলা শুয়ে শুয়ে শোনা যাবে—বিমানটা কি করে মল। আমার বিশ্বাস, ওর বুক খেয়ে গেছ্‌ল। দেখছিলেন না, ভাবনায় ভাবনায় ওর শরীরটা ইদানিং কেমন প্যা-কাঠি হয়ে যাচ্ছিল, তারপর হয়েছিল 'পক্স'। দুর্ব্বল শরীরে সমস্ত রোগই পেয়ে বসে। তবে দুঃখ যে আমার তার সঙ্গে দেখাটা হল না; অনেকদিনের বন্ধুত্ব।

রমেনের ইহা বলিতে বলিতে যেন মুখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সুবর্ণ বলিল কাকীমা! উনি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়চেন। ওঁর বিছানা কোথায়?

ইন্দুমতী বলিলেন—রমেন আমার কোলের কাছেই শুতে চেয়েচে। ঐ এক পাশে আমার বিছানা, আর এক পাশে রমেনের বিছানা।

ইহা বলিয়া তিনি রমেন, রমেন বলিয়া ডাকিলেন ও ভাল হইয়া শুইতে তাহাকে বলিলেন। রমেন আর উঠিল না। এক-রূপ গড়াইয়াই ইন্দুমতীর খাটের সন্নিহিত শয্যায় শুইয়া পড়িল। তখনই তাহার গাঢ় ঘুম আসিল।

ইন্দুমতী তৎক্ষনাৎ হ্যারিকেনটি ঐ ঘরের মধ্য হইতে লইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণও বাহির হইল। তাঁহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া তেতলায় উঠিয়া দেখিলেন, অদূরে রান্নাঘরে সাধিকা খাইতে বসিয়াছে। একটি কেরোসিনের ল্যাম্প তাহার থালার পার্শ্বস্থিত

উবুড়-করা-গেলাসের উপর। তাহার সাহস যেন আজ একটু বাড়িয়াছে।

মাতা সাধিকার কাছে পৌঁছিয়া চুপি চুপি বলিলেন—ময়না, তুই আর তোর সুবর্ণ-দিদি তেতলার ঘরে শুবি। আমি আর রমেন দোতলায় থাকবো। কিছু ভয় নাই মা! ভয় করে আর কি হবে!

সাধিকা যন্ত্রচালিতার মত মায়ের কথায় সায় দিল। সে সুবর্ণের পানে তাকাইয়া বলিল—দিদি! আমি কি আজকাল ভয়ের কথা কিছু তোমায় বলি? মা শুধু দিন রাত আমায় সাহস দেন। হুঁ! ভয়!

ইন্দুমতী সাধিকার আশ্বাসবাণীতে ভরষান্বিতা না হইয়াও বলিলেন—বেশ, বেশ।

সুবর্ণ তখন বলিল—কাকীমা! তা হলে আপনি কিছু মুখে দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবর্ণ কাকীমাকে এক বাটি দুধ ও দুইটা বরফি-সন্দেশ দিল। কাকীমা খাবনা, খাবনা বলিয়া ভাণ করিলেন। কিন্তু সুবর্ণ তাঁহাকে ধমক দিলেন—'বুড়ী, না খেয়ে মর্বে?

অতঃপর কাকীমা তাহা মুখে দিয়া এক ঘটি জল পান করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সাধিকা আহারান্তে সকড়ি বাসনগুলি জড় করিয়া মুখ ধুইয়া

তেতলায় আসিল। সুবর্ণের হাতে তাহার সাজা-পান ছিল, সে সাধিকাকে উহা দিতেই সাধিকা উহা মুখে পূরিল। তারপর দুইজনে তেতলার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার রাত্রিকালের দৃশ্য দেখিতে লাগিল ও দুই একটি তৎসময়োপযোগী গল্প করিতে লাগিল। যখন রাত্রি এগারটার ঘণ্টা অদূরস্থিত কল-বাড়ীতে বাজিল তখন তাহারা ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিল।

অতিসাবধানী ইন্দুমতীর চোখে যে ঘুম আসিতেছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই দুইটি তরুণী গভীর নিদ্রায় অচিরেই নিমগ্না হইয়া পড়িল।

ক্রমে রাত্রি যখন দুইটা বাজিল তখন ইন্দুমতী ও ঘুমাইলেন। এই সময় হঠাৎ যেন সাধিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উৎকর্ণা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—শব্দটা কোথা হইতে আসিল। কিন্তু সে কিছুতেই অনুমান করিতে পারিলনা, কি ব্যাপার।

সাধিকা অতি ধীরে ধীরে সুবর্ণকে গা-নাড়া দিয়া ডাকিল কিন্তু সে উঠিলনা।

সাধিকা পুনরায় ত্রিতলের কক্ষটির অতি সন্নিকটে পূর্ব্ববৎ দুম দাম শব্দ ও ক্রমে দরজায় আঘাত করিবার শব্দ শুনিতে পাইল।

সে তখন সুবর্ণকে ডাকিবার জন্য অপেক্ষা আর না করিয়া নিজেই দরজা খুলিল ও সরাসরি ছাদে চলিয়া আসিল এবং

ক্ষণপরে পুনরায় ঘরে গিয়া সুবর্ণকে ঠেলিয়া বলিল—'দিদি, একটু বাইরে যাবো, ওঠ।'

সুবর্ণ ও সাধিকা বাহিরে আসিয়া পুনরায় ঘরে গেল ও দরজা বন্ধ করিল। সাধিকার কিন্তু আর ঘুম আসিল না। সে ঘুমন্তার মত সুবর্ণের সহিত শুইয়া রহিল।

ওদিকে রাত্রি তিনটার সময় ইন্দুমতী শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আস্তে আস্তে রমেনের বিছানা হাতড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দুমতীর সাহস হইল না যে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখেন রমেন ঘরে আছে কিনা। তাঁহার ভয় হইতেছিল পাছে রমেনের ঘুম ভাঙ্গে, যদি সে ঘরে শুইয়াই রহিয়া থাকে।

উদ্বেগের দিবারাত্রি যেন অধিকতর দীর্ঘ হয়। এ গৃহেও সে রাত্রি তাহা হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই রমেন বিশেষ কিছু না বলিয়া পাঞ্জাবীটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরিয়া কাকীমাকে 'তবে আসি' বলিয়াই বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মাতা মেয়েকে রমেনকে ডাকিয়া ফিরাইতে বলিলেন, কারণ সাধিকা তখন নীচে কলতলায় ছিল।

সাধিকা রমেনকে ডাকিতে যেন সঙ্কুচিতা হইল; তবুও সে ডাকিল—রমেনবাবু! মা আপনার টাকা নিতে আপনাকে ডাকচেন।

রমেন তাড়াতাড়ি জবাব দিল—আর একদিন আসবো; আফিসের বেলা হয়ে যাবে। ও টাকা তোমরা খরচ করো।

মেয়ে মায়ের কাছে তাই বলিল।

সুবর্ণ বাড়ী ফিরিবার সময় কাকীমাকে চুপি চুপি জানাইল—কাকীমা! কাল রাতে ছাদে নাকি কেমন শব্দ হয়েছিল, দরজায় নাকি কিসের ঘা শোনা গেছল।

তিন

কুল-গাছের কুল ফুরাইবার সময় হইল, আমের গুটি বেশ বড় হইতে চলিয়াছে, শিবরাত্রির পর্ব্ব কাটিয়া গেল কিন্তু কার্ত্তিকের দেখা নাই। নদেরচাঁদের তাই বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সে যেন মন-মরা হইয়া গুমট হইয়া বসিয়া থাকে; আর কোনও কাজ তাহার ভাল লাগে না। কার্ত্তিক ছিল নদেরচাঁদের কিন্তু নদের-চাঁদ ও তো কার্ত্তিকের বটে। তাই সে চেলা হারাইয়া বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছিল।

তাঁহার বাবা উদ্ধবচন্দ্র তাহাকে যে কোনও কাজে বলিতেন, সে যেন চড়া চড়া কথা বলিয়া দুম দুম করিয়া বাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া খেজুরতলা অথবা খড়ের পালার আঁড়ালে গিয়া বসিয়া

থাকিত। আর তাহার মা কোনও কাজের ফরমাস করিলে 'পার্বো না' বলিয়া ঝাঁকিয়া উঠিত। মাতা পুত্রকে বকিয়া উচ্ছন্ন দিতেন আর বলিতেন—

'হারামজাদ! খাওয়া আসে কোথা থেকে? রাশ রাশ খাবি আর কুঁদে বেড়াবি। লক্ষ্মীছাড়া! মর, মর,।

'পুত্র মাতার কর্কশ স্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত—এমন গলা তো শুনি নি। যেন প্রতি কথাগুলো এক একটা বঁড়া-বাঁশের ওপর কুড়ুলের ঘা। ভগবান তোমাকে মেয়ে করেছিল কেন? মেয়ে-জাতের মতন তো কিছু দেখি না।

মা ছেলের এমন অপমানী কথায় আরও জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতেন—শূয়োর! বয়াড়! নিয়ে যা তোর বউমাগীকে আর বাচ্চাগুলিকে। পাব্ব না খেতে দিতে। বছর বছর মাগী আবার একটা করে বিয়োচ্ছে।

এই বলিয়া নদেরচাঁদের মাতা যেমন কুরুক্ষেত্র করিতেন, নদেও তাহাতে নিরস্ত্র সৈনিক হইত না। কিন্তু নদেরচাঁদের পিতা পুত্রের ভয়ে জড়সড় হইয়া নদেরচাঁদের মাতাকে হয় ঠেঙ্গা লইয়া তাড়া করিতেন, নতুবা ভাঙ্গা একখানা প্রপিতামহের আমলের পিঁড়ি ছুড়িয়া মারিতেন।

পত্নী ঐ সময় স্বামীকে আসিয়া ঘাড় ধরিয়া ঘরের হাতিনায় বসাইয়া দিতেন। তখন স্বামী নিরুপায় হইয়া—'মর খুনোখুনি করে

দুজনে। ও দবীর মা! তোরা একটু এ বাড়ী আয়। এগুলো তো খুনোখুনি করে মল, একটু ঠেকা, আমি তো মহামুস্কিলে পড়লাম।'

তখন দবীর মা, চিন্তার বউ, রমার বোন প্রভৃতি স্ত্রী-সেনানী আসিয়া নদেকেই বকিত।

নদেরচাঁদ কিন্তু তাহাদের কথা বেশ শুনিত। তাহার পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব রাখা যে অত্যন্ত প্রয়োজন; তাহার কারণ অবশ্য বড়ই সুস্পষ্ট ছিল—দিনের মধ্যে ছয়শত বার তামাক টানিয়া কলিকা ফাঁটাইতে আর কোথায় সে পারিবে? বাড়ীতে অত তামাক কিনিবার পয়সা যে বড়ই অপ্রতুল। মাতা যে মালসায় আগুন রাখিবার জন্য পুত্রকে একমুঠো তুষ দিতে গালাগালি করিয়া ভূত ছাড়াইতেন।

এমন পরিবারে নদেরচাঁদের জন্ম, বৃদ্ধি, শিক্ষা।

বাল্যকাল হইতেই নদেরচাঁদের পড়ার প্রতি বিশেষ অরুচি ছিল। পড়ার কথা বলিলেই সে গিয়া পিতার কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিয়া যাইত, যথা, পাটের দড়ির লেছি তৈয়ারী করিয়া দিতে, অথবা হোগলার বেড়ার চটা চাঁছিতে, অথবা যজমানী করিতে যাইবার সময় গামলাটা বহিয়া লইয়া যাইতে।

যদি এমন কোনও না-কাজের সময়,—যেমন ঠিক বেলা দুইটা, আড়াইটার কালে তাহাকে পড়িতে বসিতে তাড়া দেওয়া হইত,

তবে হয় সে বেতবাগানে লুকাইয়া বেতফল খাইত, না হয় ঝোঁপের ভিতর কাদা-খোঁচা ডাহুক-ডাহুকীর প্রেম-বিরহ লক্ষ্য করিত, অথবা তেপান্তরের মাঠে গিয়া এ গরুকে খোঁচা মারিত, ও গরুর লেজ ধরিয়া মোড়াইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত।

শেষে বেলাটি সুন্দর বৃথা কাটাইয়া সন্ধ্যা ঘোর হইলে বাড়ী ফিরিত। তখন হয় পিতা তাহাকে খড়ম-পেটা করিতেন, না হয় মাতা খুন্তী পোড়াইয়া তাহার পিঠে দাগ দিতেন। সে আর তখন কি করিবে? য়ঁ্যা য়েঁ্যা করিয়া কাঁদিয়া একথালা ভাত গিলিয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

এইরূপে তাহার শিশু-শিক্ষা হইয়াছিল।

এখন তাহার বয়স চব্বিশ পঁচিশ। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি সমাজদার, শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। বিবাহে নাকি পণ বাবদ মাত্র সাড়ে তিনশত টাকা নগদ পাইয়াছিল।

তাহার বধূটি যে নেহাৎ কুৎসিৎ ছিল তাহা নহে। কলিকাতার রাস্তায় কাবলী-সু পায়ে দিয়া, সায়া-সেমিজ পরিয়া, গাউন-সাড়ী গুঁজিয়া, চোখে চশমা হইলে তো ভালই হয়, হাতে মাত্র কয়েকটি চুড়ি ও কব্জি-ঘড়ি পরিয়া, মাফচেন ঝুলাইয়া হাটিয়া গেলে কে না তাকাইবে এমন তরুণ, যাহারা কলেজে পড়ে বা হালে কলেজ-ছাড়া 'ইয়ংম্যান্'?

কিন্তু সেই বধূই এখন শাশুড়ীর গালাগালি খায়, আর চোখের জলে ভাসিয়া নিছক অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ছেলেমেয়ের মা সে না হইয়া কোথায় যাইবে?

নদেরচাঁদ কার্ত্তিকের সহপাঠী ছিল না, প্রায় সমবয়সী ছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে, অথবা পাড়ার বিন্দুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, অবশ্য তিনি তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বলিয়া দিবেন—ও পাড়ার হরবিলাস আর চক্কোত্তিদের পদি দু মাসের ছোট-বড়; হরবিলাস হয় এক অগ্রাণে, পদি হয় শ্রীপঞ্চমীর দিনে, তা হলে কার্ত্তিক আর নদে দু বছরের ছোট-বড়। অর্থাৎ এমন হিসাব যাহাতে ইউক্লিডও হার মানিয়া যাইবে;—দুইবাহু পরস্পর অসমান হইলেও একেবারে মিলিয়া যাইবে।

যাহা হউক কার্ত্তিক নদেরচাঁদের বোধ হয় বছর দুয়েকের ছোট। সে নদেরচাঁদের একপাড়ার না হইলেও, একক্লাশে না পড়িলেও জহুরী হইয়া জহর চিনিয়াছিল।

কিন্তু সেই কার্ত্তিক বিহনে আজি নদেরচাঁদ মণিহারা ফণী। সংসারে তাহার কিছু ভাল লাগিত না। কিন্তু নির্দ্দয়া মাতা তাহাকে ও তাহার পত্নীকে ছেলেপিলে লইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু এই নদেরচাঁদই যে কার্ত্তিক বাড়ী থাকিতে মাতাকে কত সময় কত হিঞ্চার ডগা, কলমী-শাক জল সাঁতরাইয়া তুলিয়া

দিয়াছে, অকৃতজ্ঞ মাতা কি তাহা এখন একবার ভাবিয়া দেখে ?

সেবার দীঘলিয়ার মিত্তির বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড নিমন্ত্রণ ছিল। সারদাচরণ মিত্র মরিলে তাহার পুত্রেরা মহা ঘটা করিয়া দানসাগর-শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, কত দিগ্দেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ টিকিধারী নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণিক, তার্কিক, বৈদান্তিক পণ্ডিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

নদেরচাঁদ ইঁহাদের একজন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কত বড় একটা পিতলের বালতি আদায় করিয়া শেষে উহা বিক্রয় করিয়া পরিশেষে একটা বকনা-বাছুর অগ্রদানীর নিকট হইতে পাঁচসিকা পয়সা দিয়া কিনিয়া আনিয়া মাতাকে দিয়াছিলেন। মাতা কি সেই বকনার দুধের আস্বাদ আজও পাইতেছেন না ? কিন্তু সেই গাভীর দুগ্ধের একচুমুক দুধ ও আজ নদেরচাঁদের মাতা নদেরচাঁদের তৃতীয়া কন্যাকে দিতে গররাজী। ইহা তাঁহার মাতৃধর্ম্মের কলঙ্ক নহে কি ?

নদেরচাঁদ এই সব ভাবিয়া আরও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সে তাই একমনে কামনা করিত—মা মরুক।

কার্ত্তিক বাড়ী হইতে যাইবার পরও নদেরচাঁদ দিনকতক ঠিক পূর্ব্বকার জীবন যাপন করিয়াছিল।

একদিন ঘুম থেকে উঠিয়া পায়খানা প্রভৃতি সারিয়া আসিয়া সে মাকে বলিয়াছিল—মা, দুটো মুড়ি নামিয়ে দাও তো, ক্ষেতে

বেশ মোটা মুলো হয়েচে, তাই দিয়ে খাবো। মাতা ইহা শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া বলিয়াছিলেন – ও বাবা! তুই হলি কি? তিন চারটে ছেলে মেয়ের বাপ হতে চল্লি, এখনও সকালে খাওয়া? আর কাপড় ছাড়া, সন্ধ্যে-আহ্নিক কি তুই চুলোয় দিইছিস?

এই দিন হইতেই নদেরচাঁদের সঙ্গে তাহার মায়ের তুমুলকাণ্ড আরম্ভ হইল।

মাতা যেন পুত্রের চোখের বিষ হইল। নদেরচাঁদের সেই সময় হইতে কার্ত্তিকের অভাব মনে জাগিল।

সে ভাবিয়াছিল—ঐ মুড়ি খাইয়া সে পূর্ব্বদিকের বাড়ী-ঘেঁষান বিষকাঁটালিগুলি তুলিয়া ফেলিবে, ও সকাল হইতে উহা তুলিতে আরম্ভ করিলে বেলা দুপুরের আগে সেগুলি সব তোলা হইবে এবং দিনের রৌদ্র পাইলে উহা শুকাইয়া যাইবে; তারপর আহারাদি শেষ করিয়া একটু ঘুমাইয়া বৈকাল তিনটা চারিটার সময় বাড়ীর দক্ষিণের পুকুর হইতে জলে-ভেজান-বাঁশ তুলিয়া কাটিয়া গোঁজা বানাইয়া ও বাখারি তৈয়ার করিয়া লাউগাছের জাঙ্গালাটা বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু মাতাই অতি প্রত্যূষে সেদিনকার জঞ্জাল বাধাইলেন, আর তাহার কিছুই ভাল লাগিল না।

সে তদবধি মায়ের সঙ্গে আঁড়াআঁড়ি দিয়া চলিল; মাতাও ছাড়িবার পাত্র নহেন।

গলার কাঁটা

শুনিয়াছি—নদেরচাঁদের পিতা যখন তৃতীয়বার বিবাহ করেন, তখনও পাড়ার অক্ষয় বাড়ুয্যে কাঁচা নয় শত টাকা মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া নদেরচাঁদের বাবাকে বিবাহ দিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। নদেরচাঁদের মায়ের বয়স তখন নয় বৎসর ছিল। বৎসর প্রতি তাঁহার একশত টাকা দাম পড়িয়াছিল। অবশ্য নদেরচাঁদের দাদামহাশয় নদেরচাঁদের মায়ের প্রতি বৎসরে দেড়শত টাকা অর্থাৎ নয় বৎসরে - মোট সাড়ে তেরশত টাকা দাবী করিয়াছিলেন।

নদেরচাঁদের এত দামী-মাতার দাপট কি তাই কোনও মতে কম হইতে পারে? ছেলের তিনি কেন তোয়াক্কা *রাখিবেন যদিও তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশের ঘেঁষাঘেঁষি? দাঁত একটিও পড়ে নাই, চুল একটি আধটি বর্ণ-চোরা হইয়াছে মাত্র, বোধ হয় উহাতে শীঘ্রই রং ফলিবে এবং গায়ের রংকে চিনাইয়া দিবে—আমি তোমা অপেক্ষা ফর্সা হইয়াছি। হাতে পায়ে এখনও তাঁহার বেশ বল আছে। নেহাৎ দুই ক্রোশ না হাটিলে তাঁহাকে বসিতে হয় না।

মাতার চক্ষুশূল হইয়া নদেরচাঁদ প্রায়ই বাড়ী থাকিত না। এর বাড়ী তার বাড়ী করিয়া বেড়াইত আর খাওয়ার সময় আসিয়া ঝগড়াঝাঁটি করিয়া খাইত। তাহার চেষ্টা ছিল, কোনও মতে দুইটা নাকে-মুখে দিয়া বাটীর বাহির হইতে পারিলে হয়। তারপর ঐ

বুড়ী যাহা ইচ্ছা তাহা করুক। কিন্তু এ-রকম করিয়া কতদিন চলে ?

একদিন বাড়ীতে রান্না করিবার তরকারী-পত্র বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ লাউগাছে যে কয়েকটি লাউ জন্মিয়াছিল, তাহার সকলগুলিই মাতা 'বশ' করিবার জন্য পাকাইয়া বুড়া করিতেছিলেন ; বেগুনগাছে এত বেগুন আছে, তাহার একটিও তিনি তুলিবেন না, সেগুলি বীজ থাকিবে ; ক্ষেতের কড়াইশুঁটি ফুরাইয়া গিয়াছে ; কুমড়া বসিয়া পাকিতেছে,—উহাদ্বারা ভরা-বর্ষার সময় চলিবে ; অন্যান্য শাক-পাতা তিনি ছিঁড়িবেন না, তাহাতে গাছ মরিয়া যায়। *

নদেরচাঁদের বউ তাই রান্নার জিনিসের অভাব বোধ করিল, শুধু চারটী ডাল তাঁহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে সে মহা বিপদ গণিল, কারণ তাহার স্বামী ডাল স্পর্শ করে না ও খাওয়ার তরকারী না থাকিলে বিশেষ কলহ করে। অবশ্য বধূমাতা ঠিকই বুঝিয়া ছিল তাহার শ্বশ্রূমাতার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে ঐ ছুঁতায় গোলমাল করেন, নতুবা এত তরকারি ক্ষেতে থাকিতে তিনি বৃথা অজুহাতে তাহা তুলিতে দিবেন না কেন ?

বধূমাতার স্পষ্টই মনে হইল, তাহার স্বামী কেন জাল ফেলিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরে নাই যদিও তাহাকে এই কয়েকদিন খাইবার সময় ঐরূপই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল।

বধূমাতা তাই জানিল, আজ দ্বিপ্রহরে না জানি কি প্রমাদই ঘটে! সে নিজমনে নিজেকে বলিল—যদি একবার দাদা আসত, তবে গিয়ে পার হতাম আর এই খেঁচাখেঁচির সংসারে পা দিতুম না। নিত্য ত্রিশ দিন কি আর এ ধাতে সয়? কেন মাছ ধরে নি, তাই শুধু-ভাত খাবে, যদিও যথেষ্ট তরকারি পুঁজি আছে। এ জেদ নয়?

বধূমাতা এজন্য বিশেষ ভীতা হইয়া শ্বাশুড়ী-নির্দ্দেশ মত ডাল, ভাত রান্ধিয়া রাখিল।

বেলা প্রায় বারটা বাজে কিন্তু স্বামীর দেখা নাই। শ্বশুর খাওয়া হইলে, তিনি নীরবে দুটি ডাল, ভাত খাইয়া উঠিয়া আস্তে ঠুক ঠুক করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্বশ্রূমাতা মুখখানা হাঁড়ি করিয়া গিয়া পা ছড়াইয়া বাস্তু-ঘরের দরজায় বসিয়া রহিলেন। বধূমাতা ও রান্নাবান্না শেষ করিয়া রান্নাঘরেই মেয়েটিকে বুকের দুধ টানাইতে টানাইতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে একটা বাজিয়া গেল। তবুও নদেরচাঁদ আসিল না। শেষে নদেরচাঁদের মাতা দুপ দাপ করিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গিয়া পার্শ্বস্থিত বাড়ীর ভোম্বলকে গলা ছাড়িয়া ডাক দিলেন যে নদে কোথায় গেল, হারামজাদা কি মল?

ভোম্বল বামুন-দির প্রশ্নোত্তরে বলিল যে নদে-দা এ-বেলায় আসবে না। আমি ও নদে-দা ও গ্রামে চৌধুরী-বাড়ী যাত্রা-গান

শুনতে গেছলাম, আমি চলে এসেছি, নদে-দার পালাটা খুব ভাল লেগেছে বলে ওর শেষ না শুনে সে ফিরবে না। যাত্রা-দল বরিশালের ঝালকাঠি থেকে এসেচে, বেশ ভাল গায়। বিশেষতঃ ঘোরাসুর-বধ পালাটায় তাদের খুব নাম।

বামুন-দি ভোম্বলকে জিজ্ঞাসা করিলেন— যাত্রা কখন ভাঙ্গবে ?

ভোম্বল বলিল—সাড়ে চারটা, পাঁচটা হবে।

বামুন-দির ক্রোধের যেন পরিসীমা থাকিল না। একে তো তিনি নদে-দার উপর চটিয়াই আছেন, তাহাতে এই সংবাদ।

চৌধুরীদের বাড়ী ঐ গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, সেই দূরতর স্থানে পুত্র যাত্রা-গান শুনিতে গিয়াছে, ইহাতে বাড়ীতে কিছু বলিয়া যায় নাই, ইহা কি কম ক্রোধের বিষয় ?

বামুন-দি সাঁই সাঁই করিয়া বধূমাতার কাছে গেলেন এবং রান্নাঘরের মেঝেয়-শোয়া বধূমাতাকে ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিয়া তুলিয়া বলিলেন—

বউ মা! নদে কি খেয়েচে ?

বধূমাতা জবাব দিল—আমি তো জানিনা মা!

শ্বাশুড়ী বলিলেন—ও সব ন্যাকামি রেখে দাও। জান, ধাঁড়ী-বাচ্চা এ-বাড়ী থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় দোবো—যদি না দিই, তবে আমার নাম ব্রেহ্ম নয়।

বধূমাতা শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া চোখে বস্ত্রাঞ্চল দিল, কারণ এতাবৎ সে দূর করিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়াছে, কিন্তু 'ঝেঁটিয়ে বিদেয়ের' কথা শোনে নাই। সে ক্রোড়স্থিত কন্যাটিকে মাটিতে ফেলিয় দিল, মাতৃক্রোড়ের অর্দ্ধ-সুপ্ত কন্যা-রত্ন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বধূমাতা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেই লাগিল।

ব্রহ্মময়ী ইত্যবসরে গৃহমধ্যে অতিদ্রুত প্রবেশ করিয়া একলম্ফে মাঁচার উপর উঠিয়া সমস্ত হাতখানি মুড়ির কলসির ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন এবং দেখিলেন মুড়ির ভিতর লুকান পাটালি গুড়ের অর্দ্ধেক নাই, মুড়িও অর্দ্ধ-কলসি হইয়া গিয়াছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া ফেলিলেন—নদে নিশ্চয়ই মুড়ি, গুড় কাপড়ে বাঁধিয়া অতি ভোর বেলা যাত্রা শুনিতে বাহির হইয়াছে, নতুবা এত বেলা না খাইয়া সে কিছুতেই রহে নাই।

ব্রহ্মময়ীর পুত্রের উপর যে কি ক্রোধের উদ্রেক হইল, তাহা আর কেহ না বুঝিলেও ঐ ঘরে যে বৃদ্ধ খাইয়া শুইয়া ছিলেন তিনি বুঝিয়াছিলেন।

পত্নী এক দৌড়ে স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীকে এত জোরে ধাক্কা দিলেন যে তাহার ঘাড়ের বেদনা সারিতে রীতিমত তিন সপ্তাহ নূনের সেঁক, ভাঙ্গের সেঁক ও কবিরাজী ঔষধের মালিস দিতে হইয়াছিল। কিন্তু

বৃদ্ধের ঘাড়ের বেদনা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত সারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

স্বামী গৃহিনীর গায়ের বল দেখিয়া বাস্তবিকই হিন্দুশাস্ত্র-কারদের তখন নিন্দা করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে এ জাতিকে যাহারা অবলা বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এমন স্ত্রী-রত্ন-লাভের সৌভাগ্য হয় নাই।

নদেরচাঁদ সে-দিন যাত্রা শুনিয়া যখন বাড়ী পৌছিয়াছিল, তখন বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। ব্রহ্মময়ী মন-ভারী করিয়া পার্শ্বস্থিত দবীর মার বাটী গিয়া গল্পের আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন এবং দবীর মার নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছিলেন যে বড় বৌ বড়ই মুখরা, মিথ্যাবাদিনী, দজ্জাল। তাহার বাপের কুলে কেহ নাই যে একবার এ-বাড়ী হইতে তাহাকে লইয়া গিয়া নদেটাকে রক্ষা দেয়। নদেকে পরামর্শ দিয়া বড় বৌ এমন খারাপ করিয়াছে।

দবীর মা ও ব্রহ্মময়ীর কথায় পূর্ণ সায় দিয়া ফিসফিস গলায় চোখ মুখ ভেঙ্গাইয়া কত কি বলিল। সে জাতিতে নাপিত ছিল এবং জাত্যানুযায়ী শঠতা তাহার যথেষ্ট ছিল।

সে চুপি চুপি বলিল—'তা নৈলে মাসি! নদেরচাঁদ এমন সোণার ছেলে, বয়সও তার কম হয় নাই, সে কিনা মাকে বলে—হারামজাদী, তুই কেন আমাকে জন্ম দিয়েছিলি? তোর গর্ভে জন্মে আমার এমন খোঁয়াড় দুগগতি; ও পাড়ার কার্ত্তিক

কেমন বউ নিয়ে বাসায় থাকে, আর আমার বৌ এখানে বসে ধান ভানচে, বিষকাঁটালি পুড়িয়ে ভাত রান্ধচে, আর উঠোন ঝেঁটোতে ঝেঁটোতে তার কোমরটা মোটা হয়ে গেল।' আচ্ছা মাসি, এ সব বৌয়ের শেখান-কথা না? কার্ত্তিক কালিয়ায় বিয়ে করেচে, তাদের একটা শিক্ষিত জায়গা, সেখানকার মেয়েরা যেমন চলে-ফেরে, আমাদের দেশের মেয়েরা কি ও রকম পারে? ঐ বৌ-মাগীর ইচ্ছে, কার্ত্তিকের বৌয়ের মত সে বাসায় বাসায় থাকে আর সোয়ামীকে করে 'হাতের পায়রা।' মাসি! ঐ বৌ-ই তোমার হচ্চে খারাপ। আর দেখনা নদেরচাঁদের আজকাল বুদ্ধি কেমন হয়েচে, সংসারে যেন তার মনই লাগে না? মাসি, সে আমার কাছে চুপিচুপি গেছে বিষ্যদবার বলেচে- শীগগিরই সে কলকাতা চলে যাবে, মাত্র তার পথ খরচটা জোগাড় হলেই হয়। শেষে কলকাতা গিয়ে আর কিছু না পারে মুটেগিরি করে খাবে, ফিরিওয়ালাগিরি করে পেট চালাবে; তবু আর এ সংসারে থাকবে না।

ব্রহ্মময়ী দবীর মার কথায় একটু চিন্তিতা হইলেন আর ভাবিয়া দেখিলেন নদেরচাঁদ হয়ত রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার মাথায় ইহা কখনও ঢোকে নাই, ঐ দবীর মা-ই নদেরচাঁদকে এই পরামর্শ দিয়াছে—কেন সে বাড়ী থাকিয়া এত ক্যাট ক্যাটি সহ্য করে? কেন সে বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা

গিয়া যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বউ-ছেলে-মেয়ে লইয়া বাস করিয়া সুখে না থাকে ?

যাহা হউক ব্রহ্মময়ী ওখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি একপায়ে দুইপায়ে বাড়ী আসিলেন।

এদিকে নদেরচাঁদ বাড়ী পৌঁছিয়াই দেখিয়াছিল, তাহার ছেলে-মেয়েগুলা এখানে ওখানে ধূলায় গড়াইয়া কাঁদিতেছে। কাহারও নাক হইতে বিশ্রী বাহির হইতেছে ও চোখ মুখ ফুলাইয়াছে। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া বাড়ীতে কাহাকেও না দেখিয়া সরা-সরি রান্নাঘরে গিয়া এক ফোঁটা তেল লইয়া স্নান করিতে যাইবে ভাবিল। মাতা যে বাড়ী নাই, সেজন্য সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস যে না ফেলিল, তাহা নহে।

কিন্তু রান্নাঘরে তেলের ভাঁড় ঝুঁকিয়া আনিতে গিয়া তাহার চোখে যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার সারাদিন না-খাওয়ার ও না-স্নান করিবার জন্য যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা অপেক্ষা বহু শতগুণ কষ্ট হইল। সে দেখিল—তাহার বধূ কাদা, জলের মধ্যে পড়িয়া লোটাইতেছে। মুখে যেন কত অশান্তি কত উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছেলে মেয়ে, বিশেষতঃ কোলের মেয়েটা যে কোথায় তাহাও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। শিশুটির মাথায় গায়ে কাদা শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে গিয়া পাস্থার বেড়ার ধারে শীর্ণ হইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছে।

নদেরচাঁদ বাস্তবিক এ-সংসারে অত দুঃখের মধ্যে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার মুগ্ধা বধূকে। অমন লক্ষ্মী বউ বোধ হয় আর দুইটি পাওয়া যাইবেনা, ইহা পরশ্রীকাতরা দবীর মাও মনে মনে না স্বীকার করিত, তাহা নহে। নদেরচাঁদ আস্তে আস্তে তাহার পত্নীকে ডাকিল। পত্নীও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, প্রায় অন্ধকার হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার জন্য চিন্তা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সেই আঁধারের আলো তাহার মাথার কাছে। তাঁহার আহার হয় নাই, স্নান ও হয় নাই, শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ।

বধূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—একেবারে সন্ধ্যে করে এসেচো, কখন নাইবে? কখন খাবে? যাও, যাও, দেরি করো না। মা যেন কি কাণ্ড বাঁধান। লক্ষ্মী প্রাণ আমার! তুমি মায়ের কথায় কোনও জবাব দিও না, তোমার পায়ে পড়ি। যাও, ওঠ। ঐ যে তেলের ভাঁড় তোমার সামনে—আর স্নান না কর্ল্লে, বেলা গেছে, হাত পা ধুয়ে এস। আমি ভাত বাড়ি।

নদেরচাঁদ উল্লসিত হইয়া যেন বলিয়া উঠিল—দেখ কমলা! ঘোরাসুর যে বিক্রম দেখিয়েছে, তা আমার মাও সে-দিন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার সময় দেখাতে পারে নি।

কমলা স্বামীর এই কথায় জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—ছিঃ! তুমি হলে কি? চিরকালই তোমার এ-ভাবে যাবে? ওঃ, বুঝেছি,

কার্ত্তিক ঠাকুরপোর দোসর তুমি হয়েচ, ঠিক তার মত যা না বলার তাই বল। মা যে পরম গুরু। কথায় বলে—'কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনও নয়।' তুমি লক্ষ্মী! বুদ্ধি ঘরে নাও। কার্ত্তিক ঠাকুরপো ওরূপ হলেও, তিনি এখানে থাকতে তো তুমি অমন ছিলে না। তিনি গেছেন আর তোমার বুদ্ধি গেছে। তিনি কি তোমায় তার বিদ্বের বরাত দিয়ে গেছেন ?

নন্দেরচাঁদ একটু তেল মাথায় ঘষিতেছিল আর যাত্রা-গানের সহস্রমুখী প্রশংসাবাদ করিতেছিল, ইত্যবসরে মাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

বেশ ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বৌ নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বেশ, তাই হোক। আমি এসব অন্যায় চোখে দেখতে পার্ব্বো না যে দিনরাত বৌয়ের সাথে পুটুর পুটুর আর আমার নিন্দে আপনি কচ্ছেন একবার, উনি কচ্ছেন একবার। যান, পালান, এ বাড়ীতে আর ভাত নাই।

এই বলিয়া মাতা পুত্রকে উঠান ঝাঁড়ু দিবার ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিলেন।

কমলা এক নয়নে তাকাইয়া রহিল। সন্তানগণ ঠাকুরমার চীৎকারে চেঁচাইয়া উঠিল। নন্দেরচাঁদ কিছুকাল একভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে ঘাটের দিক চলিয়া গেল।

কমলা মনে করিল, স্বামী স্নান করিতে গিয়াছে।

বাড়ী হইতে নীচে মাঠে নামিয়া নদেরচাঁদ আর পুকুরের দিকে গেল না। সে একমনে মাঠের রাস্তা দিয়া হাটিয়া একটা ডোবা হইতে একটু জল হাতে তুলিয়া মাথায় চাপড়াইয়া মাথাটা ঈষৎ ধুইয়া ফেলিয়া বরাবর চারু-দির কাছে গেল।

চারু-দি নদেরচাঁদকে বাড়ীতে পৌঁছিতে দেখিয়া বলিলেন—ওকি নদেরচাঁদ? ওকি ভাই! তোমার কি হয়েচে? কতদিন যে তোমায় দেখি না? তোমার শরীর দেখি অর্দ্ধেকও নাই। মুখখানা যে বড্ড শুকনো। খাওয়া দাওয়া হয় নাই নাকি?

নদেরচাঁদ হাসিয়া বলিল— দিদি, রাগ কর্ব্বে না তো? বল, তা হলে বলি।

চারু-দি বলিলেন—না রাগ কর্ব্ব না।

নদেরচাঁদ বলিল—চারু-দি! আজ সকালে চৌধুরী-বাড়ী যাত্রা শুনতে গেছলাম আর এখন এই পথে ফিরচি। অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয় না, এখন একরকম তোমাদের খলট দিয়ে যাচ্চি, তাই তোমার সঙ্গে দেখাটা করে গেলাম।

চারু-দি অবাক হইয়া বলিলেন—ও বাবা! এখন বেলা দেখি ডুবু ডুবু। এখন যাত্রা শুনে বাড়ী ফিরচো? হ্যাঁরে ভাল সখ! তা যাক, বাড়ী এখন যেতে পার্ব্বে না। যাত্রা শুনে মাথাটা গরম হয়েছিল, তাই বুঝি মাথায় জল দিয়েচ? তা বেশ। দুটো চিড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে কাঁচা দই দিয়ে দিচ্চি, তাই খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা

কব। এখন কিছুতেই না খেয়ে বাড়ী যেতে পার্ব্বে না। বস, তোমার সাথে অনেক কথাও আছে।

চারু-দির কথা মত নদে-ভাই খাইতে বসিল এবং একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

'চারু-দি! তুমি আমার দিদি না হয়ে যদি মা হতে!'

এই সময় অরুন্ধতী আসিয়া বলিলেন—ও কি নদেরচাঁদ? আমার সোনার চাঁদ! তুমি কি বাছা! ডুমুরের ফুল হয়েচ? কার্ত্তিক বাড়ী নাই, আর নদেরচাঁদ-কার্ত্তিকের দেখা নাই।

চারু-দি হাসিয়া মায়ের কাছে বলিলেন—মা! শোনো, কি বিদঘুটে কথা। এই এখন যাত্রা-দলের গান শুনে ফিরচে। শুনতে গিয়েছিল সেই ভোর পাঁচটায়।

অরুন্ধতী এই সংবাদে মাথায় হাত দিলেন এবং নদেরচাঁদকে ঐ ভাজা-পোড়ার পাতে ও-বেলার ঠাণ্ডা ভাত ও মাছের ঝোল দিতে কন্যা চারুবালাকে বলিলেন।

নদেরচাঁদ ভাত খাইতেছে আর মাতা-কন্যা নদেরচাঁদের চরিত্রের অমায়িকতার প্রশংসা করিতেছেন, ইত্যবসরে পোষ্টাফিসের পিওন মতি একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আনিয়া বলিল—'মা-ঠান! একটা টেলিগ্রাম।'

টেলিগ্রামের শব্দে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন, কারণ এ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের বাঙ্গালীঘরের টেলিগ্রাম—হয়

ইহাতে মৃত্যুসংবাদ অথবা ঐরূপ কিছু সাংঘাতিক খবর থাকিবে। ইহা বিদেশীয় রীতির নহে যে কথায় কথায় 'ওয়্যার' কর। এত পয়সা এ-দেশীয়েরা কোথায় পাইবে?

নদেরচাঁদের আর খাওয়া হইল না। সে একদৌড়ে ঘাটে গিয়া হাত-মুখটা ধুইয়া বরাবর গাঙ্গুলি মাষ্টারের বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহাকে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—

মাষ্টার মশায়! শীগগির চলুন, চারু-দিদের একটা টেলিগ্রাম এসেচে। নদেরচাঁদের যে টেলিগ্রাম পড়িবার বিদ্যা ছিল না এবং পল্লীগ্রামের যে অনেকেরই তাহা থাকে না, এজন্য গাঙ্গুলি মাষ্টার নিজেকে গর্ব্বিত মনে করিত। পাড়ার লোকেও এজন্য তাহাকে যত শ্রদ্ধা দিত, এত শ্রদ্ধা বোধ হয় সেক্সপীয়র তাহার ষ্ট্রাড-ফোর্ড-এভনে পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি মন্থর-গতিতে আসিয়া গম্ভীর ভঙ্গিমায় টেলিগ্রামটি খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন—

ব্রহ্মাণ্ডনাথ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

তাঁহার পক্স অর্থাৎ মায়ের দয়া হইয়াছে। তিনি এজন্য ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

চার

সুবর্ণ অনেকদিন হইতেই ভাবিতেছিল সাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিবে বিমান বাবুদের সঙ্গে তাহাদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল। সাধিকাও তেমনি মনে করিতেছিল শুনিবে সুবর্ণের এই মন্দভাগ্য কতদিন হইল হইয়াছে। কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের ভিতর যেন লজ্জা আসিয়া প্রতিরোধ করিতে বসিয়াছিল। একজনে লজ্জাটা ভাঙ্গিয়া দিলে অন্যে বেশ বলিতে পারে; কিন্তু কে প্রথম আরম্ভ করিবে তাহাই মুস্কিল এবং তাহা লইয়া কতদিন কাটিল।

অবশ্য দুইজনের এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর ছিল। দুইজনে দিবসের অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত করিত।

প্রতি রাত্রিতে দুই বন্ধুতে এক বিছানায় শয়ন করিত ও কথা-বার্ত্তা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িত।—সে যে কত রাজ্যের কত খবর, কত সমস্ত ভূত প্রেতের আজগুবি গল্প, কত দুঃখ, কত হা-হুতাশ, কত কান্নার বৃত্তান্ত তাহা পার্শ্বের শয্যাস্থিতা ইন্দুমতী শুনিয়া না বলিয়া পারিতেন না—

বাবা! তোরা এত কথাও জানিস? তোদের চোখে কি ঘুম আসে না?

ইন্দুমতী ইহা বলিতেন বটে কিন্তু তিনি মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিতেন না—'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার!'

সুবর্ণ অবশ্য কাকীমার ঐ কথায় জবাব দিত—কাকীমা! আমরা নয় না ঘুমিয়ে গল্প করি, কিন্তু বলুন তো আপনি জেগে জেগে কি করেন? আমাদের নয় গল্প করে ঘুম আসে না, আপনাকে চোখ বুজতে তো আমরা কখনই দেখি না। আমাদের গল্প শোনার শ্রোতা তো আপনিই একমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সাধিকা-সুবর্ণের মনের কথা বলাবলি করিবার সময় অবশ্য রাত্রিকাল ছিল না; কারণ ইন্দুমতী কাছে থাকিতে তাহা কি করিয়া চলে? কিন্তু উভয়েই সুযোগ খুঁজিতেছিল।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সাধিকা আহারান্তে ছাদে গিয়া উত্তরের দিকের আলসের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নের ছোট মাঠখানিতে দুইটি ছাগশিশুর ছাগমাতার স্তন্যপান করা দেখিতে-ছিল, আর মনে বড়ই আনন্দ পাইতেছিল। ছাগীটা কিছুতেই বাচ্চা দুইটাকে দুধ খাইতে দিবে না, বাচ্চা দুইটা তো দুধ খাইবেই—তাহারা যেন মায়ের দুইখানা পেছনের পায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল আর সুবিধা মত জোর করিয়া একটি করিয়া চাটা মাইয়ের গায়ে দিতেছিল, ছাগমাতা তো রাগিয়া অস্থির, শেষে বিশেষ ক্রুদ্ধা হইয়া সন্তান দুইটিকে শিং নাড়িয়া তাড়া করিল। তখন তাহারা বুঝিল মাতা তাহাদের বাস্তবিকই রাগ করিতেছে। তাই দুগ্ধ পানে তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই শুষ্ক একগাছি তৃণ মুখে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

সাধিকা ঐ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময়া হইয়া কাতরা হইয়াছিল, পরিশেষে ক্ষুণ্নমনে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেই সে বোধ করিল, তাহার দক্ষিণ চিবুকখানা যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। সে সহসা তাহাতে হাত দিয়া গালখানি রগড়াইতে রগড়াইতে ভাবিতে লাগিল—এত তাত কোথা হইতে লাগিল।

সে চকিতদৃষ্টিতে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কোনও কারণ বাহির করিতে পারিল না। শেষে দেখিল যে একটা চলমান ছোট রৌদ্র ফলক যেন তাহার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

সাধিকা তখন চমকিতা হইল ও বুঝিল কে যেন দূরস্থ বাটীর ছাদ হইতে আয়না সূর্য্যমুখী ধরিয়া উহারই আলোকের প্রতিবিম্ব তাহার মুখে গালে চোখে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে।

সে তখন ভীত হইয়া দ্রুত নীচের তলায় মায়ের কাছে চলিয়া গিয়া বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্রমে বেলা সাড়ে তিনটা, চারিটা হইল। সাধিকার কয়েক দিনের অভ্যাস মত ঘুমটি কিন্তু সে-দিন আসিল না। সে শুধু মায়ের বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল, ইত্যবসরে স্বুবর্ণ আসিয়া ডাক দিল—ময়না কি কচ্ছ?

ময়না জবাব দিল—এই তো শুয়ে আছি।

স্বুবর্ণ বলিল—এখন আর ঘুমিয়ে কর্ব্বে কি? চল, ছাদে যাই।

এই বলিয়া সুবর্ণ সাধিকাকে একরূপ টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সাধিকার যেন কিছুই ভাল লাগিল না।

সুবর্ণ উহা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভাই! একটা কথা বলবে? ময়না জবাব দিল—কি বলব সুবর্ণ-দি? সুবর্ণ-দিদি বলিল—ভাই! তোমার মনটা তো আজ তেমন ভাল দেখচি না। ময়না উত্তর করিল—সুবর্ণ-দি! রোজ কি মন একরূপ থাকে? সুবর্ণ-দিদি কহিল—কেন? আজ আবার নূতন করে কিছু আসলো নাকি? ময়না জবাব দিল – এলে তো ভাল হত।

দুইজনে এরূপ কথা-কাটাকাটি করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—

ময়না! ইচ্ছা করে নির্জ্জনে বসে আমরা দুজনায় মিলে সব সময় গল্প করি। ভাই, তোমাকে দেখা অবধি আমার প্রাণটা তোমায় মনের মত করে ভালবাসতে ইচ্ছে করে আসছে কিন্তু ভাই! মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি আমায় পর মনে কর বা ঘৃণা কর। তা নইলে ভাই, তুমি কেন আজ তোমার মনটি খারাপ করে গুমড়ে আমার কাছে বসে আছ? কিন্তু ময়না, আমি তোমায় যে অত্যন্ত ভাল-বাসি, বিশ্বাস করি তার প্রমাণ এখনই তোমায় আমি দিতে পারি কিন্তু তুমি তা পার না।

এই বলিয়া সুবর্ণ গায়ের সেমিজের নিম্নের উন্নত বক্ষের কোলে লুক্কায়িত লাল, গোলাপী, সবুজ কতগুলি খাম তথা হইতে বাহির

করিল। তাহার উপর কেমন সুন্দর আঁকা-বাঁকা ফুল-কাঁটা লতা পাতা বা রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বা 'মনে রেখো' বা 'আমি তোমারি' ইত্যাদি সুন্দর ছাপা ছিল। ঐ খামগুলির ভিতর যেন দিস্তায় দিস্তায় সুগন্ধ কাগজে-লেখা-চিঠি।

সুবর্ণ উহা বাহির করিতেই সহাস-মূর্ত্তিতে সাধিকা বলিল—ও কি দিদি! কার প্রাণের ডালা উবুড় করে তোমার কাছে দিয়েচে? এ কার গচ্ছিত ঐশ্বর্য্য?

সুবর্ণ বলিল—আগে বল ভাই! তুমি আজ মন খারাপ করেছিলে কেন?

সাধিকা তখন অন্তকার দ্বিপ্রহরের সেই আয়নার প্রতিবিম্বের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা সুবর্ণের নিকট বলিল। সুবর্ণ উহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—পাড়ার লোকে তা হলে টের পেয়েচে এ বাড়ীতে বেটাছেলে কেউ থাকে না। তবে তো মুস্কিল। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বদমায়েস, গুণ্ডার প্রকোপ। দেখো ভাই, সাবধানে থাকতে হবে। নৈলে তো মহাবিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, রমেন বাবু বেশ ভাল লোক না? তাকে এনে এখানে রাখা চলে না? তিনি থাকলে এখানে কোনও ভয় থাকবে না।

রমেনের নামোচ্চারণে সাধিকার মন বিকৃত হইল। সে বিশেষ কিছু বলিল না।

সুবর্ণ আবার বলিল—আমার তো ভদ্রলোককে বেশ লাগে।

কেমন ব্যভার, কেমন আলাপ, বেশ রগড়ে-লোক কিন্তু তিনি। ভাই, এ তুমি বুঝে দেখ, নইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

দুইজনায় এরূপ ছাদের মেঝেতে লোটাইয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল এবং একে অন্যের চোখে চোখ রাখিয়া কত কি ভাবিতেছিল, ইত্যবসরে দেখিল যে সেই ছাদের উপরে, তাহাদেরই অতি সন্নিকটে একখানা কাগজের ঘুড়ি ঠক করিয়া পড়িল।

সাধিকার ঘুড়ি ধরিবার বেজায় নেশা এই কলিকাতার এই বাসায় আসা-অবধি হইয়াছিল। অনেকদিন সে অনেক ঘুড়ি নিজে ধরিয়াছে আর বিমান-দা ও বহুদিন বহু ঘুড়ি নিজে ধরিয়া তাহার আদরের ময়নাকে দিয়াছে। বৈকাল বেলা হইলেই বিমান-ময়নার এই এক আনন্দের খেলা ছিল।

সেই পুরাতন অভ্যস্ত আনন্দ-লাভের বশবর্ত্তিনী হইয়া সাধিকা নিজেই গিয়া ঐ ঘুড়িখানা ধরিল ও টপ করিয়া ঘুড়ির সূতাটা কাটিয়া দিল। তাহার বোধ হয় যেন মনে ছিল না, আজ তাহার বিমান-দা নাই। ময়না তৎক্ষণাৎ ঘুড়িখানা হাতে লইয়া পরম উল্লসিত হইয়া বলিল—সুবর্ণ-দি! এ মুখ-পুড়ী খানা কেমন নতুন দেখচো?

সুবর্ণ-দি তাহার হাতের চিঠিগুলি, উহা যে স্থানের ও যে নিভৃত স্থানে লুকাইবার, সেই জায়গায় রাখিয়া দিয়া বলিল—কই দেখি।

সাধিকা ঘুড়িখানা সুবর্ণ-দিকে দেখিতে বলিয়া হঠাৎ ঘুড়িখানার

ছুই দিক ভাল করিয়া তাকাইতেই দেখিল, উহার এক পৃষ্ঠের মাঝ-খানে লেখা আছে—

"বলো ঘুড়ি! বলো তারে।
সে যেন চিনিতে পারে॥"

এবং অন্য পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে লেখা আছে—

ঘুড়ি! তুমি আমার-ই,
যে ধরে, তুমি তারও—ই
তবে সেও হবে আমারি॥

সাধিকা এই বিশ্রী ছড়া দুইটি পড়িয়া আর যেন স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হাত হইতে ঝুপ করিয়া ঘুড়িখানা ছাদে পড়িয়া গেল। সে তখন আর অধিক কাল তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে ভরষা পাইল না।

সুবর্ণ সাধিকার হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনে কোনও কথা না বলিয়া ঘুড়ি খানা ছাদ হইতে কুড়াইয়া লইয়া নিজে উহার এদিক ওদিক দেখিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

ময়না, বড়ই বিপদ গণচি। চল, দোতলায় যাই। কাকীমার কাছে আজ দুপুরের কাণ্ড আর বিকেলের ব্যাপার বলি, দেখি তিনি কি বলেন।

সুবর্ণ অতি দ্রুতগতিতে নামিয়া গেল, সাধিকা যন্ত্রচালিতার মত ভয়ে ভয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

সুবর্ণ নীচে আসিয়া কাকীমাকে সমস্ত এক এক করিয়া বলিলেন কিন্তু তিনি তখনই সুবর্ণকে একটি ছোট্ট কথা যাহা বলিলেন, তাহাতে সুবর্ণের সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

সাধিকা অদূরে থাকিয়াও তাহা শুনিয়াছিল না বলিয়া রক্ষা, নতুবা সেই মুহূর্ত্তে যে দ্বিতীয়-'স্নেহলতা' না হইত, তাহা বলা যায় না। কেরোসিণ তৈল এক বোতল ঘরে তো ছিলই, দেশলাইও যে ঘরে না ছিল, তাহা নহে আর উপরের তেতলার ঘরও নিভৃত ছিল, রাত্রি হইতেও মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী ছিল। কিন্তু সাধিকাকে সে কথা ভগবান শুনাইবেন কেন? তাহা হইলে যে এই সপ্ত-কাণ্ড নর-রামায়ণ শেষ হইবে না, জন্ম-দুঃখিনী নারী-সীতার দুঃখ সংক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। রক্ত-মাংসের বাল্মীকিমুনি হইবার সাধ ও যে রচয়িতার অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাক।

ইন্দুমতী ঐ কথাটি বলিলে সুবর্ণ মনে করিল—কাকীমা আমাকে নেহাৎ আপনার জন মনে করিয়াই ইহা বলিয়াছেন, আমি যদি উহা সাধিকাকে বলিয়া দিই, তবে আমার বিশ্বাসঘাতকতার পাপে ডুবিতে হইবে, অধিকন্তু সাধিকার স্নেহানুবর্ত্তিনী হইতে গিয়া আমি কাকীমার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া আমার স্নেহের সাধিকার দর্শন পাইব না।

সুবর্ণ তাই সাধিকাকে বলিল—ময়না, আমার বড্ড পিপাসা পেয়েচে, এক ঘটি জল দেবে?

সাধিকা বলিল—সুবর্ণ-দি, সূয্যি ডোবে ডোবে, এখন জল খাবে? দাঁড়াও, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, তাড়া তাড়ি সন্ধ্যেটা লাগিয়ে তোমায় জল দি।

এই বলিয়া সাধিকা ঘর ঝাঁটাইতে ব্যাপৃতা হইল। সুবর্ণ কাকীমাকে আস্তে আস্তে বলিল—কাকীমা! আপনি বৃথা ময়নার উপর রাগ কচ্ছেন। ছিঃ! ও কথা বলতে আছে—ময়না সে দিন দুপ দাপ করে দরজা খুলে রমেনের জন্য এসেছিল?

কাকীমা ডাকিয়া বলিলেন—সুবর্ণ! তুই তো কিছু জানিসনা, ও-মাগী এখন জ্বালায় ছট ফট করে বেড়াচ্ছে, বিমানটাকে খেয়েচে, এখন তো আর একজনকে চাই। ওর জন্যে উনি গেলেন, ওর জন্যে আমি যেতে বসেচি। ওটা তো গেচেই।

সুবর্ণ বলিল—কেন? কাকীমা! আমি সব শুনেচি, আপনি যা তা বলবেন না।

সুবর্ণ অবশ্য ইহাদের কিছুই ইতিবৃত্তান্ত এ-যাবৎ জানিত না, কিন্তু পাকচক্রে তাহাকে তো উহা শুনিতে হইবে ইহা স্থির করিয়া সে বলিল—না কাকীমা! আপনি বৃথা ও হতভাগিনীকে দোষী কর্ব্বেন না। আপনি স্থির হোন। রাগ কর্বেন না।

কাকীমা যেন রাগের আরও ইন্ধন পাইলেন। তিনি বলিলেন—

আচ্ছা সুবর্ণ! তুমি যেমন সাজে সেজেচো, আমার যেমন সাজ, ঐ হারামজাদীকেও সেই সাজ পরান উচিত ছিল। এক দিকে মন

রৈল, আর একটি ঢাকের বায়া থাকলো, তা কি চলে ? ঐ বিমান-টাকে ও-ই খারাপ করেছিল। কেন বাপু অত মেশামেশি ? তিনি পুণ্যবান ছিলেন, তাই রক্ষে পেয়েচেন। তিনি কি কিছু বুঝেছিলেন না যে ঐ মাগীতে আর বিমানেতে খারাপ হতে পারে ? তাই তিনি শীগগির শীগগির ওটাকে বিয়ে দিয়ে ফেললেন, কিন্তু ওটা ঐ বিমানের সঙ্গে দিনরাত মাথামাথি কর্ত্ত, আর আমার চোখে ধূলো দিত। কার্ত্তিক কি আমার মন্দ জামাই ? কেমন মায়া কেমন বুদ্ধি ! কেবল একটু পাগলা-ছাঁট ছিল। কিন্তু ঐ মাগী তাকে মোটেই দেখতে পার্ত্ত না। এখন বোঝ কেমন সুখ। বিমানটা মরে গেচে, তার পাপের বোঝা শেষ হয়ে গেচে, এখন যদি বেয়াই ওকে নিয়ে না যায় তবে দেখ দেখি ওটাকে নিয়ে আমি কি করি ? সুবর্ণ ! ময়না যে আমার 'গলার কাঁটা' হয়েচে। ওর যন্ত্রনায় যে আমার প্রাণ বেরুবার উপক্রম হয়েচে। কিন্তু তা বের করে ফেলাও যে মস্ত দায়। আমি শুধু ডাকের দিকে চাইচি, আর পথের পানে তাকিয়ে আছি—দেখিনি বেয়াই কোনও খবর দেন। যাক। তা আর চাই না। আমি কিছু বলবো না, হারামজাদী যা খুসী তা করুক, দুটো খেতে পেলেই হয়। রমেনটাকে খবর দিয়ে এ-বাসায় এনে রাখি, অথবা এটাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। তাও যদি না হয় ওটা বেশ্যাগিরি করে থাক আর আমি গঙ্গায় ডুবি। সুবর্ণ ! ঐ রাতের দুপ দাপ শব্দ আর কিছু নয় ;

তোমার চোখে ধুলো দেওয়া, পাছে তুমি কিছু বল। কেন সে আগে দরজা খুলেছিল, তাই ঐ মাগী সাফাই কর্চ্ছে। স্বুবর্ণ! ঐ বিছানার নীচে একখানা পোষ্টকার্ড আছে, লিখে দাও— রমেন যেন পত্রপাঠ এখানে চলে আসে, মহা বিপদ।

স্বুবর্ণ কাকীমার ক্রোধের ব্যপদেশে যে সংবাদ ও হুকুম পাইল তাহা তাহার অনুকূল ও মনোরম বোধ হইল। সে স্বীকার করিল —কাকীমা! তাই-ই কর্ব্ব।

সাধিকা তাহার সায়ংকৃত্য শেষ করিয়া আসিয়া মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল—

মা! চল, আমরা এ বাসা ছেড়ে চলে যাই।

মাতা উত্তর করিলেন—কোথায় যাবো?

সাধিকা বলিল— কেন কালিয়ায়?

মাতা 'হুঁ' করিয়া একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জবাব দিলেন— সেখানে গিয়ে কি খাবো?

সাধিকা প্রশ্ন করিল—এখানেই বা কি খাবো?

মাতা উত্তর করিলেন—এখানে তবু ভিক্ষা মিলবে। দেশে যে তা ও জুঠবে না; আজকাল দেশের যে অবস্থা। দেশে ক-জন লোক আছে? যারা আছে তারাও তো ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে রয়েচে, পেটে পিলে-যকৃৎ, হাত পা লাঠির মত, চোথ ছুটো শুধু মস্ত বড় চক চক করে, রক্তের লেশও নাই

শরীরে। দেশে না আছে ডাক্তার, না আছে কেউ দেখবার, শুনবার। দেশে যারা একটু ভাল হয় তারাই সহরে চলে আসে, আর দেশটাকে করে রেখে আসে শ্মশান, যেন মর্লে সেখানে যেতে হবে। কিন্তু এই দেশই যে একদিন ছিল শান্তির উৎস, দীন দুঃখীর স্থান। এখন আর সেখানে গিয়ে কি ফল হবে? কলকাতা যেমন বড়লোকের, তেমনি গরীবের। আর এখানে মান-অপমান বলে জিনিস নাই। তুমি ভিক্ষেই কর আর জজিয়তীই কর, তুমি যেমন চেনাবে, এখানকার লোকে তেমন চিনবে।

সুবর্ণ ইন্দুমতীর কাছে বসিয়াছিল, সে কাকীমার কথার কিছুমাত্র বুঝিতেছিল না যে কাকীমা, যিনি কিছুকাল পূর্ব্বে মেয়ের বিরুদ্ধে অত বড় সাংঘাতিক দুর্নাম দিয়াছিলেন তিনি যে ও-রূপ সরলভাবে আলাপ করিবেন।

তখন সেও সুর পাল্টাইয়া বলিল—

কাকীমা! জানবেন আমাদের দেশের অবনতি হচ্ছে, দেশ ছেড়ে যদিও দেশ না ছেড়ে উপায় নাই। বাল্মীকি মুনি কেন যে জননী আর জন্মভূমিকে স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন, তার কারণ বোঝবার মত লোক আজকাল থাকলেও কেউ দয়া করে তা বুঝতে চায় না। ঐ যে পাথরগুলি গুঁড়িয়ে যে কৃত্রিম পাথরের সৃষ্টি হয়, লোকে আজকাল তা-ই কেনে, কিন্তু আসল যে পর্ব্বত থেকে তোলা-পাথর তা কেউ কষ্ট করে ব্যবহার কর্ত্তে চায় না।

নকলের আদর আজকাল বেশী। প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য কি এখন লোকের অনুভব কর্ব্বার শক্তি আছে? এখন চাই ছাঁকা বাহার। বাঙলার তাই অধোগতি। বাঙলার পল্লীগ্রামের সেই অন্নসত্র, কাঙ্গালীভোজন, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, সব গেচে। কেউ কাউকে দুটো চাল দেবে সে প্রবৃত্তি এখন নাই। এর মূল কারণ অর্থের অনটনও বটে, অর্থের অপব্যবহারও বটে। প্রত্যেকের ভেতর আজকাল বিলাসিতার ছড়াছড়ি। পল্লীগ্রামে থেকে তো সেরূপ আপাতরম্য সৌখীনতার প্রশ্রয় দিতে পারে না, তাই প্রত্যেকে সহরে চলে আসতে চায়, আর সহরটাকে বায়ুরুদ্ধ করে এখানে কঠিন পীড়ার সৃষ্টি করে, যেমন যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি। কাকীমা! এখন আমাদের বিশেষ মঙ্গল হবে, যদি আমরা এই নাগরিক জীবন উপেক্ষা করে পল্লীজীবনের আশ্রয় লই, আর বাংলা-মায়ের সেবা করি। কিন্তু আমাদের এখন সে উপায় নাই। যেখানে ভিক্ষা পাওয়া যায়, চাকরি পাওয়া যায় সেখানেই আমাদের থাকতে হবে। তাই কাকীমা! আপনার কথামত সহরই একমাত্র আমাদের এখন কাম্য, যেখানে বার-জাতের ভিক্ষান্ন জোঠে।

সেই সন্ধ্যার আলোচনাদির ফলে কিছুই স্থির হইল না, এই মাতা ও কন্যার এখন কোথায় থাকা সুবিধাজনক, কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই আশা করিতেছেন ব্রহ্মাণ্ডনাথ কি করেন বা কোন পর্য্যন্ত

আসেন। তারপর তাঁহার মতামত জানিয়া উভয়ে পথ-নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল ইন্দুমতীর বিশেষ চিন্তা হইতে লাগিল, বিমানের টাকা ফুরাইয়া গেলে তাঁহারা কি করিয়া সংসার-খরচ চালাইবেন বা বাড়ী-ভাড়া দিবেন। বামুন ও ঝিকে তো তাঁহারা অনেকদিম বিদায় দিয়াছেন এবং এই বাড়ীর মাত্র এক অংশ রাখিয়া বাকী অন্য অংশ বাড়ীওয়ালাকে ছাড়িয়া দিয়া কম ভাড়া দিতেছেন কিন্তু এখনকার এই কম ভাড়া, এই অল্প খরচ, তাহাই বা তাঁহারা কোথা হইতে চালাইবেন, যদি আয় কোনও দিক দিয়া কিছু না থাকে।

ইন্দুমতী তাই দিনরাত্রি অত্যন্ত ভাবিতেন ও তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না।

তারপর ইন্দুমতীর আর একটা অসুবিধা বিশেষ বোধ হইত— কে বাজার বা বাহিরের অন্য কিছু কাজ করিয়া দেয়।

তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে কাশীমিত্রের স্নানঘাটে স্নান করিতে যাইতেন ও দুই চারি পয়সার আলু, কুমড়া, কাঁচাকলা, তেঁতুল ইত্যাদি স্নানঘাটের বাজার হইতে কিনিয়া আনিতেন, কিন্তু ইহা ছাড়া বাহিরের কি কোনও কাজ ছিল না যাহার জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইত ?

যদিও সুবর্ণ সমস্ত বুঝিয়াই তাহার ছোট ভাইকে দিয়া এ বাড়ীর আবশ্যক-কার্য্য করাইয়া দিত, তথাপি ইন্দুমতীর বিশেষ

লজ্জা বোধ হইত কেন তিনি এই স্কুলের ছাত্রটির পড়ার সময় নষ্ট করেন।

সুবর্ণ প্রথামত তখন বাড়ী ফিরিয়া গেল। ইন্দুমতীও কন্যাকে পার্শ্বে বসাইয়া সহসা নিজ হাতে তাহার চুলগুলি এক মুঠো করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—হাঁ করেছিস কি? ময়না! চুলগুলি যে জড়া বেঁধে গেছে! আয়, ছাড়িয়ে দিই।

এই বলিয়া ইন্দুমতী বুক ভাঙ্গিয়া যেন একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার মনে এখন অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে কেন তিনি তাহার সেই আদরের ময়নাকে লক্ষ্য করিয়া রাগবশে কতগুলি অকথ্য-কথা সুবর্ণকে বলিয়া দিয়াছেন? সুবর্ণ তাহাদের অতি নবীন সাথী। কেন তিনি তাহাকে এই লাঞ্ছিত গৃহের চির গোপনীয় কথা বলিয়া নিজেদের হীন করিয়াছেন? ময়না তো তাঁহার কন্যা, কোনও দিনের অত্যন্ত আদরের। সাধিকার নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দুমতী তাহার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অন্যমনা হইয়া ভাবিলেন, তিনি যে গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার সংস্কার আর শত চেষ্টায় ও করা যাইবে না। তিনি তাই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ময়না উহা জানিতে পারিয়া মাতাকে বলিলেন—মা! তোমার চোখে কি এখনও জল আছে? কই এত দিনেও কি তা ফুরলো না? আশ্চর্য্য!

ইন্দুমতী আরও কাঁদিলেন এবং ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস প্রশমিত

হইলে বলিলেন—ময়না, আমি ঠিক কল্লাম আর কাঁদবোনা। কেন কাঁদবো? আমার কি হয়েছে? তিনি মারা গেচেন? হাঁ, তাতে দুঃখু হতে পারে। কিন্তু আর এমন কি হয়েচে যে এত হা হুতাশ কর্ব্ব? বিমান মরেচে? তাতে আমাদের কি? বিমান কে ছিল? বিমান তো মাত্র দেশের এক জন প্রতিবেশী ছিল। সে মরেচে, তার জন্যে তো আমরা যথেষ্ট কেঁদেচি, তবে আর কেন? আর সে-ই তো ছিল কাল। তার চক্রান্তেই তো আমাদের এমন নানাস্থানী হতে হলো। উঃ! কি ভুল করেচি! ময়না! কি পাপ করেচি! এখন তো সে-ভুল কিছুতে সারবেনা, সে-পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ইন্দুমতী ইহা বলিতে বলিতে যেন অধীরা হইলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন—ময়না! আজ আমাদের কিসের অভাব ছিল যদি আমারা শ্বশুরের ভিটায় থাকতাম? কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে আর কি এ মুখ নিয়ে দেশে ফিরতে পার্ব্ব? সবদিকই যে জঞ্জাল। তবে এক হয়, কার্ত্তিককে যদি পাই। তা সে যে নিরুদ্দেশ! কার্ত্তিক আসলেই যে আমরা আগের মত হবো। ময়না! তাই না কি?

ইন্দুমতী কার্ত্তিকের কথা বলাতে সাধিকা লজ্জিতা হইল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা মাথা যেন আনতা করিল। কিন্তু ইন্দুমতী সাহসে ভর করিয়া যেন জোর পাইলেন। তাঁহার এতদিনের ঘটনা-

পরম্পরায় বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক যেন হঠাৎ গোছালো হইয়া গেল। তিনি স্ফূর্ত্তির সহিত ময়নার চুলটা অতি পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া উঠিলেন।

সুবর্ণ আজ রাত্রিতে বাসায় গিয়া অতি সত্বর সমস্ত কার্য্য সারিয়া ফেলিয়া দ্রুত তাহার মাতার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া মাতার খাওয়া শেষ না হইতেই ময়নাদের বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহার প্রাণে যে আজ কত কথা মাথা উঁচু করিয়া উঁকি মারিতেছে, তাহা সে ভিন্ন আর কে জানিবে?

সে এ-বাসায় আসিয়াই কাকীমাকে বলিল—কাকীমা! বিপদে সাহস না করে যদি ভয় আনা যায়, তবে বিপদ যেন পেয়ে বসে। আর বিপদ সইতে ধৈর্য্য চাই। ঐ যে একজন কবি বলেচেন—ভগবান! তুমি আমায় বিপদ দাও তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সে বিপদে সম্মুখীন হতে যেন শক্তি পাই।

এরূপ অনেক দার্শনিক গবেষণার অবতারণা করিয়া সুবর্ণ কাকীমার নিকট বলিল—কাকীমা! আজ আমি আর ময়না ওপরে তেতলায় থাকবো। আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। দেখি, কোন শালা কি কাণ্ড করে।

এই বলিয়া সুবর্ণ কাকীমার আদেশ গ্রহণ করিয়া সাধিকাকে লইয়া উপরে গেল। সঙ্গে একটি হেরিকেন ও দেশলাই গ্রহণ করিল। ঘরে ঢুকিয়া সে দিন আর তাহারা দক্ষিণ-দিকের দরজা বন্ধ করিল না।

সে রাত্রি কৃষ্ণপক্ষীয়া তৃতীয়া ছিল, সুতরাং জ্যোৎস্না দেরিতে উঠিলেও উহারা যখন শুইতে গিয়াছিল তখন চন্দ্রালোক সম্পূর্ণ-ভাবেই ছাদে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ-বাতাসও বেশ তখন বহিতেছিল। উভয়ে বিছানায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় কনুইয়ে বালিস ভর করিয়া আলোটি সামনেই রাখিল। উভয়ের উন্নত বক্ষ বালিসের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল, তাহাতে তূলা-কাপড়ের বালিস ধন্য হইয়া গেল। সুবর্ণ আলোটি একটু উস্কাইয়া বলিল—

ময়না বিমানবাবুর জন্যে তা হলে তোমার বড্ড কষ্ট হয়—না?

ময়না সুবর্ণ-দির সহসা এইকথা উত্থাপন করাতে বলিয়া ফেলিল —কি আর কষ্ট! যে গেছে তার জন্যে কষ্ট করে কি ফল? হঠাৎ একথা কেন সুবর্ণ-দি?

সুবর্ণ। বিমান বাবু তোমায় খুব ভালবাসতো—না?

ময়না। হাঁ, ভালবাসতো না? নিশ্চয়ই ভালবাসতো।

সুবর্ণ। তার প্রমাণ পেয়েছিলে?

ময়না। কিসের প্রমাণ?

সুবর্ণের কথাবার্ত্তা যে কি উদ্দেশ্যে হইতেছিল এবং কোন দিকে উহা গড়াইবে তাহা ময়না বুঝিতে পারিল না। কিন্তু 'প্রমাণের' কথাটা শুনিয়া সে বলিল—

সুবর্ণ দি! প্রমাণ আমার কি?

সুবর্ণ। প্রমাণ না? ভাই, প্রমাণ চাই বই কি? প্রমাণ

চাই। প্রমাণ না পেলে কি বৃথা একজনকে প্রাণটা ঢেলে দোবো, আর সে তাই নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? শেষে যদি মাঝ-দরিয়ায় ফেলে সে পালায়। তখন যে কূল-কিনারা দেখবো না। ফলে নিন্দা, গ্লানি, অপবাদ হবে, সুখও পাবোনা। আর যদি প্রমাণ পাই যে সে ভালবাসে, তবে নয় তাকে নিয়ে থাকলাম, জীবনটা একভাবে কেটে গেল। তাতে লোকে যাই বলে বলুক।

ময়না। সুবর্ণদি! তুমি কি বলচো? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা।

সুবর্ণ। আমি বলচি, বাস্তবিকই বিমানবাবু সতীশ ছিল না উপীন-দা ছিল?

ময়না এই কথায় চটিয়া গেল। বলিল—সুবর্ণ-দি! বিমান-দা আমার দাদাই ছিল। আমি তার বোনই ছিলাম। অন্য কিছু নয়। ও—বুঝেছি সুবর্ণ-দি! তুমি আমায় ইতর মনে করেচ, হয়ত কারুর কাছে কিছু শুনেচ, তাই সে ময়না-নামে গাল দিচ্চ। সুবর্ণ-দি! মনের অগোচর পাপ নাই; বিমান-দা আমার ভ্রাতৃসদৃশ ছিল, তবে বহুকাল ঘৃত-অগ্নি একত্র থাকাতে, যদি ঘিটা বা আগুন-টা বা ঘি আগুন দুইটা গরম হয়েই উঠে থাকে, তবে সে উষ্ণতা ঘৃতাগ্নি-ধর্ম্মের, কিন্তু তাতে আর ও ইন্ধন না দিলে বয়ে বা গলে যায় না। শৈত্যে আবার স্থির হয়। বরং সেই স্থিরতা পূর্ব্বাপেক্ষা চিরস্থায়ী।

ময়না এই বলিয়া চুপ করিল ও গম্ভীরভাব ধারণ করিল।

সুবর্ণ-দি বলিল ভাই, তুমি যদি আমার জীবনী শোন, তবে অবাক হয়ে যাবে। ভাই, রাগ করো না। তোমায় আমি বিশেষ স্নেহ করি, তাই বলচি। ভাই, নিশ্চয় জেনো, আমি তোমায় আঘাত দেবার জন্যে এ সব বলচি না। ময়না! পড়ে দেখ এই চিঠি গুলি, তা হলে বুঝতে পার্ব্বে, আমার জীবন কি দুঃখের। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল, সে মরেছিল বিয়ের দশবর্জ্জনের মধ্যে আর আমি যার সঙ্গে ডুবেছিলাম, সে মরেনি, চলে গেছে, লুকিয়ে আছে।

এই বলিয়া সুবর্ণ কাঁদিয়া ফেলিল।

সাধিকা এক এক করিয়া তখন সেই চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার চোখ-মুখের ছাপে যাহা বোঝা গেল, তাহাতে উহা পড়িয়া সে যে বিস্মিতা হইতেছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

কিছুক্ষণ পরে সাধিকা জিজ্ঞাসা করিল—সুবর্ণ-দি! তোমার তিনি চলে গেলেন? কি আশ্চর্য্য!

সুবর্ণ বলিল—ময়না না গিয়ে তাঁর উপায় কি? তিনি যে আমার মামা।

ময়না প্রশ্ন করিল—এ-কথা আর কেউ জানে নি?

সুবর্ণ উত্তর করিল—এক মা জানেন। তা মা নিজের ভাইয়ের কাণ্ড জেনে আমাকেও বিশেষ কিছু বলতে সাহস না পেয়ে আমায়

নিয়ে কলকাতা এলেন, মামাও গাজীপুরে এক চাকরি পেয়ে গা-ঢাকা দিলেন।

ময়না এবারে একটু প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছুক হইল, কারণ এই সুবর্ণ-দিই তো তাহাকে ইতঃপূর্ব্বে খোঁচা দিয়া কথা বলিয়াছিল। সে বলিল—

সুবর্ণ-দি এই চিঠিগুলো কি মামা গাজীপুর থেকে লিখেছিলেন? এখন লেখেন না? বেশ ভাল বাংলা জানেন তো তিনি; লেখায় বেশ কবিত্ব, ভাবও ভাষার লালিত্য আছে। সুবর্ণ-দি! এই দিস্তায় দিস্তায় চিঠি লিখতে তাঁর চাকরি করে সময় হয় তো? আর পয়সাও তো কম খরচ হয় নি। বেশ গন্ধ তো।

উভয়ে এরূপ হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া গল্প করিতে করিতে সে রাত্রিতে আর ঘরের দুয়ার বন্ধ করিবার বা নিদ্রা যাইবার আবশ্যক হইল না। ছাদে কোনও ভয়-ভীতের ব্যাপার সে রাত্রিতে আর ঘটিল না।

পাঁচ

মাণিকতলা মেসের মেম্বররা রমেনকে আজ কত দিনই বড়ই ক্ষেপাইতেছে। যেখানে যে জটলা হয় তাহা রমেনবাবুকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই হইয়া থাকে।

গলার কাঁটা

মেস-বাড়ীটি দেখিতে বেশ সুন্দর, যদিও বাড়ীটি নেহাৎ নব-নির্ম্মিত নহে, শুধু চূণ-কামের উপর আছে বলিয়াই ঝকঝকে চকচকে দেখায়। উহার সদর দরজাটা গলির ভিতর দিয়া, কিন্তু বাড়ীটির দুইটি দিক বড়রাস্তার উপরে। মেসটি ত্রিতল এবং বড় রাস্তার উপর যে ধার দুইটি, উহা ঘুরাইয়া অপ্রশস্ত লম্বা বারান্দা দুই তলায়ই আছে। ঐ বারান্দা হইতে কলিকাতার বেশ একটু দূর-তর স্থান পর্য্যন্ত চোখে আসে এবং অধিবাসীরা ওখানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের আরাম ও বিশ্রম্ভালাপ করে ; এবং বিশেষতঃ বিকালে সন্ধ্যার দিক ঐ স্থানে বিশেষ হল্লা হয়। কেহ কেহ হয়ত আরাম-কেদারায় আধা-শোয়া-অবস্থায় পড়াশুনা করিয়া থাকে। মেসটি যে শুধু ছাত্রাবাস ছিল তাহা নহে, অনেক চাকুরে ও সেখানে থাকিত। তবে চাকুরেদের কামড়াগুলি প্রায়ই দোতলায় ছিল।

রমেনবাবু কিন্তু চাকুরে হইয়াও চাকুরেদের দলে মিশিয়া বাস করিতে ভালবাসিত না। সে অবিবাহিত ছিল। তাহার বয়স যদিও ত্রিশের কোঠায় পড়িয়াছিল, কিন্তু যদি তাহাকে কেহ তাহার বয়সটা কমাইয়া কাঁচা-বয়সের অর্থাৎ চব্বিশ, পঁচিশ বছরের বলিত তবে সে ভারি খুসী হইত।

রমেনবাবুকে এরূপ কম বয়স বলিবার ও তাহা প্রতিপন্ন করিবার লোক ছিল একমাত্র অসিতারঞ্জন।

অসিত বেশ চালাক ছিল, তাই রমেনের কম-বয়সের পক্ষে ভোট দিয়া সে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া অনেক চা, বিস্কুট, কেক খাইত। রমেন ও তাহাকে বিশেষ পছন্দ করিত। দুইজনে পূর্ব্বে ভিন্ন কক্ষে থাকিত, কিন্তু এরূপ ভাব জন্মিবার পর হইতে দুইজনায় একটি ত্রি-তক্তপোষের কামড়ায় স্থান লইল।

ক্রমে উভয়ের এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে তাহাতে অন্য লোকেরা বিশেষ হিংসা না করিয়া পারিত না। অসিতের কলেজ হইতে আসিয়া অপরাহ্ণের জলখাবার আর নিজের কিনিতে হইত না, উহা রমেন বাবুর পয়সায়ই চলিয়া যাইত। রমেন বাবু এক পোয়া রসগোল্লা আনিলে অর্দ্ধেকের একটি বেশী অসিত খাইত। তার পর এদিকে ওদিকে রাস্তায় বাহির হইয়া কোনও রেঁস্তোরাঁতে ঢুকিলে তো কথাই নাই। দুই জনে খাইয়াই যাইতেছে, অসিত বারণ না করিলে চা কাপের পর কাপ আসিতেছে, যদিও অসিতের সে বারণ রমেনকে দেখাইয়া শুনাইয়াই মাত্র। এই খাওয়ান-দাওয়ান ভিন্ন রমেনবাবু অসিতারঞ্জনকে দুইচারি টাকা ধার দিত; ফেরৎ না দিলেও রমেন তাহা বন্ধুর নিকট চাহিত না।

রমেনবাবুর সাহায্যে অসিতারঞ্জনের একটা উপকার হইয়াছিল। তাহার আর আর্থিক অনটন হইত না যদিও তাহার বড়দাদা টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে বিলম্ব করিতেন। কিন্তু তাহার অন্য অপকার যাহা হইয়াছিল, তাহা অসিত এখন না বুঝিলেও পাঁচ

বৎসর পরে বুঝিবে, যখন তাহাকে বিদ্যাদেবীর পায়ে চির-বিদায় জানাইতে হইবে।

অসিত আই, এ, পড়িত এবং ছাত্র ও একটু ডাঁটো ছিল। সে বাল্য-জীবনে কেমন ছিল জানি না, ছাত্র-জীবনেও কতবার ক্লাসে গাড্ডু মারিয়াছে, তাহার খবর ও বিশেষ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনে দুই বার বিশ্রাম লইয়া যে সে তৃতীয় বার পরীক্ষা— সাগর পার হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা। আই, এ. তেও সে আহত সৈনিক হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় নাই কারণ সে যে রবার্ট-ব্রুসের মাকড়সার গল্প পড়িয়াছে এবং সেই আখ্যায়িকার সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। সে জন্য বয়স ও ঘাঁটের দিক চাহিয়া তাহার এক কুড়ি নয় হইয়াছে। সে রীতিমত আস্বাদন করিতে পারে রমেন বাবু কি চাট তাহার সম্মুখে ধরে। বিশেষতঃ সে নিজেকে সমর্থন করিত বিমান বাবুর উদাহরণ দিয়া, বিমান বাবু একজন প্রোফেসর, তাহার 'রোমান্স' দেখাইয়া। তাহার তাই বহু দিন হইতে ইচ্ছা হইয়াছে যে প্রোফেসরবাবুর 'লভারকে' একবার দেখিয়া তাহার নয়ন সার্থক করিবে, কিন্তু রমেন যে তাহাকে বিমানের ওখানে লইয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করিত।

রমেন তাই বলিত—আমার 'আইডিয়ালকে' দেখো হে। ওখানে আমায় মাপ কর্ত্তে হবে।

গলার কাঁটা

একদা সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় রমেন তাহার তক্তপোষে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, অসিত তাহার গা হাত পা ধুইয়া আসিয়া খড়ম-চটি পায়ে দিয়া ঠক ঠক করিতেছে, ঐ কামড়ার নিশিকান্ত বাবু তখন অফিস হইতে কেবল ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে দোতলার সবার-যোগেন-দা খালি গায়ে ধবধবে একখানা মিহি পাড়ের কাপড় পরিয়া—ইহার কোঁচার ফুলটি উঁচু করিয়া কোমরে গোঁজা, এক জোড়া সাণ্ডেল পায়ে, চশমা একজোড়া চোখে—আসিয়া হঠাৎ রমেনদের ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি হে রমেন ভায়া! জীবনটা কি শুয়ে পড়ে কড়িকাঠ গণেই যাবে?

আফিস হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত নিশিকান্ত বাবু গায়ের জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে দ্রুত জবাব দিলেন—'ও কথা আর বলবেন না যোগেন-দা! রমেন ভায়া সাধু-বাবা হবে।'

এই হাস্য-রসিকতায় রমেন নেহাৎ ক্রুদ্ধ বা বিরূপ হইল না, কারণ উহা হইয়া উপায় নাই, মেসের সকলেই তাহা হইলে তাহাকে পাইয়া বসিবে এবং উহা দিন দিন সমক্ষে পরোক্ষে বাড়িয়া চলিবে।

রমেন অবশ্য চোখে দেখিয়াছে, কলিতাতার রাস্তায় কোথায় কোথায়ও কতগুলি ভিখারিণী বুড়ী আছে, তাহাদের 'বল হরি' বলিলেই রাগিয়া উঠে আর গালাগালি করে, রাস্তার চেংড়ারা উহা জানিয়া বারবারই 'বল হরি' 'বল হরি' করে, এবং বুড়ীগুলিও

ভীষণ চটিয়া সেই চেংড়াদের চতুর্দ্দশ পুরুষ উৎসন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু তবুও তাহারাও ছাড়ে না, এরাও ছাড়ে না। শেষে ঢিল ছোড়াছোড়ি, কত কি হয়।

রমেন তাই সহ্য করিত ও এরূপ হাস-পরিহাস হইলে নিজেই মাতিয়া সকলের কথায় সায় দিত।

যোগেন-দা পুনরায় বলিলেন--

ভাই নিশিকান্ত! এবারে মেসে চাকর না রেখে ঝি রাখবার বন্দোবস্ত কর, তা হলে দেখবে কত ঔপন্যাসিকের রসদ এই মেস থেকেই জুঠবে। আমরা না হয় রামা, শ্যাম, যদু হবো আর 'হিরো' হবেন--রমেন বাবু। বাঁশী বাজানটা তো বিমান বাবুর কাছ থেকেই ভায়া শিখেচে। আচ্ছা নিশিকান্ত বাবু! একবার সে 'ধ্যানের ছবি'র গল্পটা তো তুমি আমায় বললে না। সেই রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো ডেসডিমোনা, কত কি যে এই ঘরে শুনতাম। নিশিকান্ত বাবু! তুমি ভাই! বড্ড বেরসিক।

নিশিকান্ত বাবু বলিলেন—না, রমেন বাবু এবার 'স্যার রজার ডি কভারলি' হয়েচেন, আর উনি উদ্বেলিত-তরঙ্গ-সিন্ধু নন, এখন উনি 'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।'

রমেন বলিল— যোগেন-দা! আপনি কি এই জন্যেই এখানে এসেচেন? আমার পেছনে লাগতে? কি বলবো, আপনি নেহাৎ গুরুজন।

যোগেন-দা জবাব দিলেন—ভায়া রাগ কচ্চ´?

রমেন কহিল—ছিঃ! আপনার ওপর রাগ কর্ব্ব?

যোগেন-দা বলিলেন—জান কি ভায়া! একটু 'রিক্রিয়েশন' সারাদিন খাটুনির পর একটু বিশ্রাম। তা দাদা! টাকাটা দাও, মেসের হাত-টান।

নিশিকান্ত বাবু কহিলেন—তা বুঝেচি, যোগেন-দার এত দয়া যে বৃথা কাজে এখানে আসবেন? যোগেন-দা! 'ফিষ্ট'টা কবে দেবেন?

যোগেন-দা উত্তর করিলেন—আর ভাই, 'ফিষ্ট!' মাসকাবারে হাত খালি। অসিত-ভায়া! টাকা এসেচে? ও মাসের চার টাকা বাকী, এ মাসেও তো এক পয়সা পাই নি। টাকার কথা বলিবা মাত্র রমেনবাবু সুটকেসটি খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল, —ভাবিল যোগেন-দা উহা পাইয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবেন কিন্তু ইত্যবসরে নিশিকান্ত বাবু বলিলেন—

ওঃ! ভুলে তো গেছি, চিঠির বাক্সে যে রমেনবাবুর একখানা চিঠি পড়েছিল—

এই বলিয়া নিশিকান্তবাবু তাড়াতাড়ি গাত্রোৎপাটন করিয়া পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া দিলেন। রমেন চিঠিখানা পাইয়া বৈদ্যুতিক আলোতে উহা পড়িতে লাগিল এবং ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল।

যোগেন-দা হঠাৎ রমেনকে চিন্তিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোথাকার চিঠি ?

রমেন একটু অন্যমনা হইয়া পড়াতে যোগেন-দার কথার জবাব দিল না। যোগেন-দা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোত্থেকে চিঠি এসেচে ? অত ভাবচো যে ?

রমেন উত্তর করিল—এই কলকাতা থেকে।

যোগেন-দা বলিলেন—যেখান থেকেই আসুক, সব ভাল তো ?

রমেন জবাব দিল—এই দেখুন।

এই বলিয়া রমেন চিঠিখানা যোগেন-দার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

যোগেন-দা চিঠিখানা তুলিয়া মাথাটি খাঁড়া করিয়া চশমাটার মধ্য দিয়া দৃষ্টি পাতিয়া উহা পড়িয়া দেখিল, কাকীমা লিখিয়াছেন এবং পত্রপাঠ যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু যোগেন-দা বুঝিতে পারিলেন না, ইনি কে। চিঠিতে ঠিকানা যাহা দেওয়া ছিল—কলিকাতা, শুক্রবার—তাহা যোগেন-দার পক্ষে বুঝা অসম্ভব।

যোগেন-দা বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, যখন 'মহা বিপদ' লিখেছেন, তখন তোমার এখনই যাওয়া উচিত, রাত আর কতটুকু হয়েচে, বোধ হয় নটাও বাজে নি। নিশিকান্ত বাবু

তৎক্ষণাৎ পকেট ঘড়িটার কাল একগাছি রেশমী 'কার' টানিয়া বলিলেন—মাত্র আটটা পঁয়ত্রিশ।

যোগেন-দা বলিলেন—যাও, রমেন! তুমি এখনই যাও, দেরি করো না। অসুখ বিসুখ হতে পারে, আর কলকাতা সহর, চতুর্দ্দিক বিপদ, কোনদিক দিয়ে কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। এখানে বিপদ ঘটাটা আশ্চর্য্য নয়, বরং বিপদ না-ঘটাটাই আশ্চর্য্য। যাও রমেন, জামাটা গায়ে ফেল, আমি বামুনঠাকুরকে বলে দিচ্ছি, তোমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখবে। 'মিল' তো নেওয়া হয়েছে।

যদিও এ ঘরের কেহই বুঝিতে পারিলেন না--চিঠিটা কোন কাকীমার, কিন্তু রমেনের জানা আছে, তিনি কে। ভাগ্যে ইহারা ঐ খোঁজ জানেন না, নতুবা ইহা লইয়া এই বিপদের চিঠি লইয়াই বা কতজনে কতরূপ ইঙ্গিত করিতেন।

সে যাহা হউক রমেন নিজে প্রস্তুত হইয়া লইল। তাহার সাজ-গোজের আর বিশেষ কিছু পরিপাটী হইল না। মাথাটায় অবশ্য ঐ সংশয়-মুহূর্ত্তেও দুই একবার চিরুণী বুলাইয়া লইল। সে সুটকেস হইতে মনি-ব্যাগটা বাহির করিয়া, অতি শীঘ্র একটা বিড়ি দেশলাইয়ে ধরাইয়া লইয়া অতি দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। যোগেন-দা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিলেন।

রমেনের আজ রাত্রিতে কাকীমাদের বাসায় প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না; কারণ দরজায় পৌছিতেই

ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তের মত যেন সুবর্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল।

সুবর্ণ বলিল—এসেচেন রমেন বাবু?

এই বলিয়া সুবর্ণ দরজায় আস্তে আস্তে টক টক করিতে লাগিল।

সুবর্ণ কহিল—চলুন, দুজনায় একসঙ্গে ঢুকি।

রমেন বাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বাঃ! অদেষ্ট ভাল, মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করেছিলেম মেস থেকে। তা দেখি যাত্রা কেমন শুভ হয়। ব্যাপারটা কি বলুন তো। বার থেকেই চিন্তাটা দূর করে ভিতরে যাই। আমার বড্ড ভাবনা হচ্চে। সেবারে তো বিমানটাকে শোধ দিইচি; এবারে কাকে দিতে হবে? আমি তো তৈরী হয়ে এসেচি।

সুবর্ণ মুখটি টিপিয়া চোখটা আয়ত করিয়া বলিল—এবারে দেবেন আমায়।

রমেন উত্তর করিল—তা আর কি করে হয়? এমন জলজীয়ন্ত প্রাণটিকে কি করে শোধ দিই। আর আপনাকে? ছিঃ! এমন দয়ালু আমি হবো কেন?

উভয়ে এরূপ কথা বলিতে বলিতে দেখিল দরজাটা যেন খোলাই আছে। দুজনায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—সম্মুখেই ময়না।

রমেন বাবু চেঁচাইয়াই বলিল—বাঃ রে ময়না! তুইও তো বেঁচে আছিস। তবে এই দুই জনকেই তো বাঁচা পেলাম। আর

রইল কাকীমা ? সে বুড়ী মরবে না। যাক, তবে কেউ মরে নি। তবে আর যে সব বিপদ ঘটুক—হাম 'ডোণ্ট কেয়ার'।

সুবর্ণ বলিল— চলুন রমেন বাবু! উপরে গিয়ে কথা হবে।

রমেন বাবু বলিলেন—তা বেশ, এখানে রাস্তার উপর হল্লা করে কি ফল ? এই বলিয়া তিনজনেই একত্র উপরে গেল; দরজাটা অবশ্য খোলা থাকিল না।

পরদিন রমেনের আফিস ছিল না, মাসের শেষ শনিবার উপলক্ষে ছুটি। রমেন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব-রাত্রিতে সুবর্ণের মারফত যে কথাগুলি সে শুনিয়াছিল, তাহাই পুনরায় কাকীমার নিকট হইতে ঝালাইয়া লইল।

কাকীমা কিন্তু মাথায় হাত দিয়াছেন, কারণ রমেনের সেই ত্রিশটি টাকা হইতে তিনি দুই টাকা কত আনা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং রমেন যদি উহা চাহিয়া বসে। কিন্তু তাঁহার চিন্তা দূর হইল তখন, যখন সে বাগবাজারে নিজে গিয়া মুটের মাথায় ঝাঁকা ভরিয়া বাজার করিয়া লইয়া আসিল।

কাকীমা উহা দেখিয়া বলিলেন— রমেন! করেচ কি ?

সুবর্ণ পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল—সে বলিল—'বাজার হুদ্দা কিন্যে আনে'—। রমেন ওস্তাদ-ছেলে, সে অমনি আগন্তুকার মুখ হইতে কথাটা টানিয়া লইয়া বলিল—'ঢাল্যে দিছি পায়।'

রমেন চট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— কোন পায়ে সুবর্ণ-দি ?

সাধিকা তখন মুখ খুলিয়া আস্তে আস্তে সুবর্ণ-দির কাণে কাণে বলিল—'কোন পায় সুবর্ণ-দি! আমি জানি।'

সুবর্ণ-দি দরজায় মুখ আঁড়াল করিয়া চোখটা ঘুরাইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল—কোন পায়ে?

সাধিকা বলিল—উপরে চল, বলবো' খন।

এই রসিকতা কাকীমা অবশ্য শুনিলেন না কিন্তু রমেন বুঝিল। সে তখন কোনও কথা বলিল না। জিনিষগুলি নিজেই তুলিয়া ডালা ভরিয়া ময়নাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডালাটা রান্নাঘরে নিয়ে যাবে না এখানে থাকবে ময়না?

ময়না জবাব দিল, আপনার কিছু ভাবনা কর্ত্তে হবে না। আপনার আনবার পালা আপনি এনেচেন, এখন আমাদের নেবার পালা আমরা নিচ্ছি।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল—ময়না! তুমি রমেন বাবুকে খেতে দিয়েচ?

ময়না উত্তর করিল—কখন দিই সুবর্ণ-দি? রমেন বাবু তো বাইরে ছিলেন। মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি টপ করে বাজারে চলে গেলেন, আর এই এসেচেন।

যথাসময় রমেন বাবুকে জলখাবার সুবর্ণ ধরিয়া দিল। মাত্র দুইটি সন্দেশ ও এক গ্লাস জল ভিন্ন সে আর কিছু খাইল না। জলযোগ শেষ করিয়া রমেন একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া

তাহার মেসের ম্যানেজার যোগেন-দাকে লিখিল যে তাহার 'মিল' যেন বন্ধ থাকে যে পর্য্যন্ত না সে মেসে পৌঁছে। কারণ ইহা হইতেও পারে, রমেন বাবু আসিবেন বলিয়া, যেহেতু তাহার অফিস আছে, বামুন-ঠাকুর যদি চাল নেয়। শুধু শুধু কেন পয়সা নষ্ট হইবে ?

রমেন বাবু পত্র লিখিতেছিল, এই সময় ইন্দুমতী তাহার দিকে একবার চাহিয়া ভাবিলেন, কেন সে-দিন সুবর্ণ তাহার কথামত রমেনকে চিঠি লিখিয়া দিল ? ভগবান! তুমিই ভরষা।

সেই বৈকালে রমেন বাবু তেতলায় বিমানের কামড়ায় শুইয়া আছে, সুবর্ণ এই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

রমেন বাবু! সব কাণ্ডই তো শুনেচেন আর এক কাণ্ড নতুন ঘটেচে, তা বুঝি শোনেন নি ?

এই বলিয়া সুবর্ণ হাসিয়া যেন ঘরটি মুখরিত করিল।

রমেন বলিল কি ? কি ব্যাপার হয়েচে ?

সুবর্ণ হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ দুপুরে আমাদের বাসার ঝি-মাগী বলছিল—দিদিমণি! তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, যদি তুমি সে কথা কারুর কাছে না বল, বিশেষ গোপন কথা, আর ভারি সাংঘাতিক। 'আমি বললাম—কি রে ঝি ? বল, বলবো না কাউকে। ঝি আমার বলবো-না-কথায় বিশ্বাস কল্লে না, সে একটা কাল নুড়ি পাথর, দেখতে ঠিক আমাদের

শালগ্রাম-শিলার মতন, তাই আমার মাথায় ছুঁইয়ে বললে,--দিদিমণি এখন বল, নইলে আমি বলবো না। এ ভদ্দর ঘরের কথা। রমেন বাবু! তখন আমি ঐ ঝির শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়ে দিব্বি না করে পাল্লুমনা। ঝি সে সময় গলাটা খাটো করে, এদিক ওদিক আট দশ বার তাকিয়ে বললে—দিদিমণি! ও বাড়ীর তোমার বন্ধু ঠাকরুণের কি স্বভাব খারাপ? দিদিমণি! এই দেখ, তোমার বন্ধুর কত গুলি চিঠি জমেচে। ঐ চক্কোত্তির গলির মেস বাড়ীর কয়েকটি ছেলে এই চিঠি পাঠিয়েচে। দেখ দিদিমণি! এর মধ্যে কোন ও ছেলেটির বয়স পঁচিশের বেশী হবে না, কাঁচা বয়েস, দেখতে কেমন রাজপুত্তুর, চোখগুলি গোটা-পটল-দুখণ্ড-করা, সব ছেলেরা কলেজ পড়ে, বেশ বড় লোকের ছেলে, কি সব জামা গায়ে দেয়, সব সিলকি, কাপড় জরিপেড়ে, পায়ে চকচকে জুতো, চশমা-আঁটা, ফিটন-বাবু। তা এ চিঠিগুলি তোমার বন্ধুকে দেবে দিদিমণি? রমেন বাবু! বুঝলেন তো? এ-কথা কাকীমাকে বলে এসেচি, আপনাকেও বলচি।

রমেন সুবর্ণের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে কি শুনিতেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল। সুবর্ণও সেখানে বসিয়া রহিল। রমেন ভাবিল—সত্যই কি এরূপ এই পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছে? যদি এই প্রকার প্রকাশিত হইয়াই থাকে, তবে ইহার কারণ কি? শুধু শুধু কি একটা ভদ্র-

পরিবারের দুর্নাম কেহ দিতে পারে? শুধু শুধু কি একটি ভদ্র-মহিলাকে লোকে এইরূপ হীন বলিয়া মনে করিতে পারে? তবে ইহার কি গূঢ় কারণ আছে, যাহা তাহার নেপথ্যে অতি সহজে ঘটিয়াছে এবং এই আগন্তুকা নারীটিরও অবিদিত? রমেন এই কথাটি বারবার ভাবিতে লাগিল।

সুবর্ণ এতক্ষণ বসিয়াছিল, সে উঠিল এবং উঠিয়া রমেন বাবুকে এই কক্ষ মধ্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রাখিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যোগ করিল। রমেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল—

সুবর্ণদি! কোথা যাচ্চেন?

সুবর্ণ বলিল—আপনি-ভাবুন।

রমেন বাবু বলিল—না, আপনি যেতে পার্ব্বেন না।

সুবর্ণ বলিল—না, আপনাকে আপনার ময়নাকে পাঠিয়ে দিই।

রমেন বাবু ভাবিল এ নারী তো বেশ সুরসিক. সে মনে মনে বলিল—কিন্তু ঠাকরুণ, আপনি রমেন কে চেনেন না! বিমান তো রমেনের কাছে 'লিলিপুট।'

রমেন প্রকাশ্যে বলিল না সুবর্ণদি! আমার-ময়নাকে পাঠাতে হবে না; আমার প্রাণের ময়না যে, সে তো কাছেই আছে।

সুবর্ণ এ কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—প্রাণের ময়না কাছে থাকলে সেদিন যাবার সময় একটা কথাও তো বলে যাওয়া হয়েছিল না।

রমেন বলিল—স্নুবর্ণদি ! মাপ করো। তবে তোমার হাতের দু-অক্ষর পেয়ে তো রাত দুপুরে ছুটে এসেচি। স্নুবর্ণদি ! এক গেলাস জল দাও তো।

স্নুবর্ণ 'দিই' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং দেখিল, মাতা ও কন্যা দুইজনে একত্র শুইয়া আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া এক গ্লাস জল ভরিতে ভরিতে কাকীমাকে বলিল- কাকীমা ! অত ভেবোনা। ওতে কি হয়েচে ? রমেন বাবু তো এখন থেকে এখানে থাকবেই। যাই, রমেন বাবুকে এক গ্লাস জল দিয়ে আসি। এই বলিয়া স্নুবর্ণ জল লইয়া উপরে চলিয়া আসিল।

রমেন এই সময়টায় ভাবিতেছিল—অনেক ভেবে দেখলাম, সাধিকাকে 'লভার' কর্ত্তে গেলে 'ট্রেচারি' করা হবে। বিমানটাকে তো বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, তার আশার জিনিস স্পর্শ কর্ব্বোনা, বিশ্বাসঘাতকতার পাপে ডুববো। তার চেয়ে এই ভাল। বেশ চালাক। ইত্যবসরে স্নুবর্ণ আসিয়া বলিল—

ওকি রমেন বাবু! তুলনা কর্চ্ছেন কে ভাল ?

রমেন যেন থতমত খাইল। সে বলিল—

'তুলনায় টিকলো না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, এ বাড়ীটাকে তা হলে কি পাড়ার লোকে 'ব্রোথেল' বলে ? এ নাম ছড়ালো কি করে ?

স্নুবর্ণ বলিল—'ব্রোথেল' মানে কি ?

রমেন জবাব দিল—'ব্রোথেল' মানে বেশ্যালয়।

সুবর্ণ বলিল—তেমনই তো বোধ হচ্ছে।

রমেন উত্তর করিল—এর প্রতিবিধান কর্ব্ব।

এই বলিয়া রমেন চিন্তা করিতে লাগিল, সুবর্ণ আসিয়া ধীরে রমেনের গায়ের উপর সুবর্ণের বক্ষের আদরের মার্জ্জার-শিশু রাবণকে আস্তে ছাড়িয়া দিল। মার্জ্জার-তনয় রমেনের গায়ের উপর মেউ মেউ করিতে লাগিল ও রমেন তাহাকে তাড়াইতে না পারিয়া—নিয়ে যাও সুবর্ণ-দি! নিয়ে যাও তোমার 'রাবণকে' বলিতে লাগিল।

সুবর্ণ-দি কিছুকাল উহা না লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল, শেষে নিকটে আসিয়া বিড়াল-বাচ্চাটি কোলে করিল এবং উহার একখানা হাত নিজ হাতে ধরিয়া উহাদ্বারা রমেনের গালে একটি থাবা মারাইল। রমেন বিড়াল-হস্তের নখরের আঘাত পাইয়া বলিল—উঃ! সুবর্ণ-দি, বড্ড লেগেচে। সুবর্ণ জবাব দিল—ব্যথা পেয়েচ বাবু? এস, হাত বুলিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সুবর্ণ রমেনের মুখে চিবুকে তাহার নারীহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। রমেন বলিল—'আঃ!'

'রাবণ' কিন্তু তখন বাবুর ক্রোড়ে কাপড়ের মধ্যে জড়াইয়া ঘুমাইয়া ঘর ঘর শব্দ করিতেছিল।

সুবর্ণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিছুকাল পরে আদরে 'রাবণকে' বক্ষে ধরিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

ছয়

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গেলেও নদেরচাঁদ গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায় নদেরচাঁদের পিতা ব্যস্ত হইলেন, কারণ পুত্র উপযুক্ত।

তিনি অবশ্য বাল্যকালে চাণক্য-শ্লোক যে না পড়িয়া ছিলেন তাহা নহে এবং 'প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ,' ইহা বেশই জানিতেন, তাই নদেরচাঁদের কোনও কার্য্যে তিনি বিশেষ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু তিনি চিন্তিত হইলে কি হইবে? গৃহিনীর অভিপ্রায় ও কার্য্যের বিরুদ্ধে যে কোনও কথা বলিবার তাঁহার উপায় নাই। বলিলে, হয় গৃহিনী নোড়া লইয়া বৃদ্ধের অবশিষ্ট দাঁত কয়েকটী ভাঙ্গিতে যাইবেন, আর না হয় গৃহের বাসন কোসন তৈজস পত্রাদি ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিবেন, অবশেষে ঘরবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া বাহির হইবেন। নদেরচাঁদের বাবা তাই গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া কিছুকাল খড়ম পায়ে উঠান ভরিয়া ঠক ঠক করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন এবং এদিক ওদিক দেখিতে ছিলেন। গাছের একটি পাতা নড়িলে কাণ উঁচু করিয়া পথপানে তিনি তাকাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল।

নদেরচাঁদদের বাড়ীতে একটি কুকুর ছিল। নদেরচাঁদ উহার নাম 'কালে' রাখিয়াছিল, কারণ কুকুরটির সর্ব্বাঙ্গ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,

গায়ের লোমগুলি ও বেশ লম্বা লম্বা সজারুর কাঁটার মত ছিল। এই 'কালের' জীবনের সহিত নদেরচাঁদের যে কত মধুময় গল্প ইতিহাস জড়ান ছিল, তাহা নদেরচাঁদের কাছে মাত্র, 'কালে' কুকুরটি বেশ —শুধু এই কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেই বুঝা যাইত। অমনি নদেরচাঁদ 'কালের' জন্ম বৃত্তান্ত—কোন ছাঁচতলায়, কোন মুহূর্ত্তে, জন্ম কালে কিরূপ দেখিতে হইয়াছিল প্রভৃতি একঘেঁয়ে বিবরণ, সকলের কাছে বলিয়া বাহবা লইত। 'কালের' বীরত্বের কথায় সে যেন নিজেই বুকটান করিত। আজ কালের দাঁত নাই, সে বুড়া হইয়াছে, তাহার রুখে যাওয়ার অভ্যাস মাত্র আছে, লড়াই করিতে সে পারে না, মাত্র বিকট ঘেউ ঘেউ করা স্বভাবটি দিন দিন বাড়িতেছে।

নদেরচাঁদের পিতা সমস্ত সময়ই আশা করিতেছিলেন 'কালে' বুঝি নদেরচাঁদের পায়ের শব্দ শুনিয়া পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবে, মনিব আসিতেছে কিন্তু তাহা আজ আর হইল না।

'কালে' মুখখানা পায়ের মধ্যে গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল।

ব্রহ্মময়ী উত্তরের পোতার ঘরের দক্ষিণ-বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া পা দুইখানা লম্বা করিয়া দক্ষিণ দিকে চালাইয়া খোঁটের কাপড়ে কিছু যজমান বাড়ীর ভিজা-চাউল-ভাঁজা লইয়া এক এক গাল করিয়া মুখে ফেলিতেছেন আর কাঁচা লঙ্কার ঝালে ঝিঁমাইতেছেন।

ইত্যবসরে তিনি হাঁক দিলেন যে তাঁহার বড়ই ঝাল লাগিয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে একটু ঝোলা-গুড় দেওয়া হউক।

বধূমাতা অবিলম্বে একটি ছোট পাথরের বাটীতে করিয়া কতকটা পাতলা-গুড় আনিয়া দিল।

শ্বশ্রূমাতা বলিয়া উঠিলেন—বাপ-ভায়ের মাথা খেয়ে কি একটু দানাও চোখে দেখ নি? 'যেমন ঘরের ছা, তেমনই মনডা।'

বধূমাতা অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় গিয়া ঐ পাতলা গুড় কলসিতে রাখিয়া শক্ত শক্ত প্রায় এক বাটী গুড় আনিয়া দিল।

এবারে শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন—ওরে বাবা! আমি কি তোমার মত সোয়ামী-খাঁকী রাক্ষসী? এত গুলি গুড় আমি খাই? একে তো আমার অম্বলের ব্যামো। জাতনেশী! আমার সংসারটাকে উজাড় কর্ব্বি, আর আমাকেও মার্ব্বি?

কমলা কোনও কথা না বলিয়া মাথা নত করিয়া রহিল। ব্রহ্মময়ী চক চক করিয়া গুড় চাটিতে চাটিতে বেশ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঐ নিস্তব্ধ-মুহূর্ত্তে কমলা অবশ্য গণিল না যে কত চাটায় ঐ কথিত গুড় কতগুলি শ্বশ্রূমাতা খাইয়া শেষ করিলেন। শেষে একটি ঢেকুর তুলিয়া কোনও মতে নিঃশ্বাসটা থামাইয়া বলিলেন—

দেখতো, রান্নাঘরে ল্যাম্পের মনে ল্যাম্প জ্বলচে, আর এখানে দাঁড়িয়ে রয়েচ? তেল পোড়ে না? একি ছাড়া-ভিটে? ও গুলিরে গিলিয়েচ?

কমলা চলিয়া গেল। রান্না ঘরে গিয়া হাঁড়ি সারিয়া শ্বাশুড়ীর জন্য এক বৃন্দাবনী ভাত বাড়িল এবং নিজে না খাইয়া ঘরে শুইয়া পড়িবে মনে করিল। ব্রহ্মময়ী বলিলেন—আমি একটু রাতে খাবো। তুমি যাও, সারোগে।

কমলা যেন বাঁচিল। তাহার খাওয়া হইয়াছে কি না হইয়াছে ইহা যে শ্বশ্রূমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ইহাতে সে বিশেষ প্রীতা হইল। সে আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া ঠেঙ্গার খিল দিল। শয্যায় শুইয়া তাহার শুধুই মনে হইতেছিল নিশ্চয়ই স্বামী তাহার দেশ ছাড়িয়া গ্রামান্তর গিয়াছেন বা ঐরূপ কিছু করিয়াছেন। কমলা যেন তারপরে আর ভাবিতে পারিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দবীর মা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ডাক দিল—মাসি! নদে এলো?

ব্রহ্মময়ী উত্তর করিলেন—যাবে কোথায়? মাগনা-খাওয়া কোথায় মিলবে? আসবেই। আজ না আসুক, কাল আসবে, কাল না আসে, পরশু আসবে। সত্যি দবীর মা! ও নচ্ছার যদি আবার আসে, তবে আর ওটাকে না বকে, কাকের পিত্তি

বেঁটে খাওয়াবো। দেখি নি, যদি তাতে ঘেন্না হয়। বউটাকে তো শীগগিরই বিদায় দিচ্চি।

দবীর মা ও ব্রহ্মময়ী সেই রাত্রিতে অনেকক্ষণ আলাপাদি করিয়াছিলেন।

পরদিন বেলা নয়টার সময় ভোম্বল আসিয়া বলিল– বামুনদি, নদে-দা কাল রাতের ষ্টীমারে কলকাতা চলে গেছেন, তা শুনেচেন ?

এই সংবাদে বামুন-দি চিন্তিতা হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন —দবীর মা যা বলেচে, তাই ঠিক হল ?

তিনি ভোম্বলকে দুই চারি কথায় বিদায় দিয়া ঘরে গেলেন এবং সংহারিণী মূর্ত্তিতে প্রথমেই কমলার মাথার এক গোছা চুল ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের বারান্দা হইতে এক লম্ফে প্রাঙ্গনে নামিয়া তদবস্থায় দবীর মার উঠানে গেলেন এবং উচ্চৈঃ স্বরে ডাক দিলেন—

দবীর মা ! এই সেই হারামজাদী, যে পরামর্শ দিয়ে ষাঁড়কে বাড়ী থেকে কলকাতা পাঠিয়েচে। একেও ঝাঁটা মেরে এক্ষুনি বের কচ্চি।

এই বলিয়া ব্রহ্মময়ী সম্মুখস্থিত এক তাড়া মুড়ো ঝাঁটা লইয়া কমলাকে দুই তিন ঘা প্রহার দিল। কমলা, যে চুলের টানের বেদনায় না কাঁদিয়া অবাক হইয়া অশ্রুসিক্ত-নয়না হইতেছিল, অবশেষে

ঝাঁটার ঘায়ের অত্যন্ত বেদনায় উঁ উঁ করিয়া জোরে কাঁদিল। তাহার সন্তানগুলি হাউ হাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

ও-দিকে উদ্ধব সমাজদার বেলা দ্বিপ্রহরে এ বীভৎস কাণ্ড চোখে দেখিয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাঁটু পাঁটু করিয়া দৌড়াইয়া গিয়া একখানা পেয়ারা-ডালের কঁচা ভাঙ্গিয়া সপাং সপাং আট দশটা ঘা দবীর মার ঘাড়ে পিঠে মারিলেন। দবীর মা 'গেচি, মরচি' বলিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিল, আর তাহার মুখে যত ছোটলোকের গালাগালি, বকাবকি ছিল, তাহা বর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী তখন ছুটিয়া গিয়া ঘাড় ধরিয়া উদ্ধব সমাজদারকে নিজেদের খলটে টানিয়া আনিয়া ঐ একই ঝাঁটা দিয়া স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন– যদি দবীর মা এখন জমিদারকে ডেকে আনে, তবে বাহাত্তোরা! তোর যে এ-গ্রাম ত্যাগ কর্ত্তে হবে, তোর মাথা মুড়ো করে তাতে যে জমিদার ঘোল ঢালবে, তা তুই জানিস?

এই ব্রাহ্মণ-বাড়ীর কাণ্ড দেখিয়া ঐ পাড়ার ধোপা, নাপিত, কায়স্থ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মময়ীর গালাগালির ভয়ে কেহ কোনও কথা সমক্ষে বলিতে পারিল না, শুধু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা ইহাও ইঙ্গিত করিল—বৌ-

মাঠান আজ গলায় দড়ি না দেয়, বা করবীফুলের বীজ খেয়ে না মরে।

পাড়ার লোকেরা এ বাড়ী হইতে নামিয়া গেলে, ব্রহ্মময়ী এক দৌড়ে ভোম্বলদের বাড়ী গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কি নদেকে ষ্টীমারে উঠতে দেখেছিস ?

ভোম্বল বলিল—না বামুণ-দি !

বামুণ-দি বলিলেন—তবে শুনলি কোত্থেকে ?

ভোম্বল জবাব দিল—শুনেচি ভাল মানষের কাছ থেকে।

বামুণ-দি প্রশ্ন করিলেন—কে সে ?

ভোম্বল উত্তর করিল—গাঙ্গুলি মাষ্টার।

বামুণ-দি পুনরায় বলিলেন—সে জানলো কি করে ?

ভোম্বল জবাব দিল—তা আমি কি করে জানবো ? শোনো গে তুমি তার কাছে।

ভোম্বলের বিরক্তিভাব দেখিয়া ব্রহ্মময়ী আর জেরা করিলেন না। সে তো আর নদে না, বা নদের বউ না, যে তাঁহাকে ভয় করিবে। ব্রহ্মময়ী তখন এক পা দুই পা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কয়েকদিন পর নদেরচাঁদ কলিকাতা হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথকে লইয়া যাত্রাপুরে ফিরিয়া আসিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের 'মায়ের দয়া' হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল, কথা কহিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, চলিতে

তো পারেনই না। পথে রেলে-ষ্টীমারে নদেরচাঁদ তাঁহাকে অতি কষ্টে লুকাইয়া ঢাকা দিয়া লইয়া আসিয়াছে। কারণ রেল-ষ্টীমারের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি জানিতে পারে যে বসন্তের রোগী, তবে তাহারা অমনি রোগীকে পথিমধ্যে যেথানেই হউক নামাইয়া দিবে, কারণ উহা স্পর্শক্রামক ব্যাধি। একজনের বীজ অন্যে ছড়াইলে তাহারও উহার আক্রমণের ভয় আছে। তাই এই যান-কর্ত্তৃপক্ষ কেন একজনের জন্য সমস্ত যাত্রীদের জীবন-সংশয় করিবে ?

নদেরচাঁদ যথন চারু-দিদের বাড়ী হইতে কলিকাতায় রওনা হয়, তথন তাহার আনন্দ আর কে দেখে ? যদিও চারু-দি ও তাঁহার মাতা নদেরচাঁদকে এইরূপ একটি ছোঁয়াচে রোগের রোগী আনিতে যাইতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। নদেরচাঁদ তথন চারু-দিকে বলিয়াছিল—চারু-দি ! আমাদের জীবনটা কি শুধু পেলে পুষে রাথবার জন্যে ? অন্যের বিপদে যদি আমরা এত ভীত হই, তবে আমাদের বিপদে অপরে গা ঢেলে উপকার কর্ব্বে কেন ? ধরুন, আমারই যদি ঐ রোগটা হত, তবে কি কার্ত্তিক আমার জন্য ছুটে যেত না ? সংসারে সবাই তো আর আমার মার মতন না।

এ-বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পথে ষ্টীমারে, গাড়ীতে নদেরচাঁদের একমাত্র আনন্দ যাহাতে হইয়াছিল, তাহা কার্ত্তিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, সেই চিন্তার আনন্দ। কতদিন সে কার্ত্তিককে দেখে না, তাহার প্রাণ যেন কার্ত্তিকের অদর্শনে দিবারাত্রি হু হু করিত।

তাহার পেটের মধ্যে কত কথা যে জমিয়া স্তূপ হইয়া আছে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে। তাই সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কখন সে কলিকাতা পৌছিবে। ষ্টীমার, ট্রেণ যেন পথ আগাইতে চাহে না। সে-রাত্রিতে নদেরচাঁদের পথে ক্ষণকালের জন্য ঘুম হয় নাই।

নদেরচাঁদ যে অবস্থায় বাড়ী হইতে চারু-দির ওখানে সেই দিন গিয়াছিল, সে ব্যাপার অন্যের ঘটিলে অপরে কিছুতেই তাহাতে ব্যথিত না হইয়া পারিত না। শত হইলেও নদেরচাঁদের বধূ, ছেলে, মেয়ে ছিল এবং মাতার এরূপ গঞ্জনার মধ্যে কিরূপে তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ? কিন্তু নদেরচাঁদ সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র টলিল না। তাহার একমাত্র দুঃখ হইয়াছিল, সে-দিন সে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত নিরম্বু-উপবাসী থাকাতেও মাতা তাহাকে খাওয়ার পূর্ব্বে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিলেন! কিন্তু এ দুঃখও সে বহুকাল মনের মধ্যে চাঙ্গা করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে-মুহূর্ত্তে সে চারু-দির হাতের দই, চিড়া, গুড় পাইল, সে মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত দুঃখ অপসারিত হইল। নদেরচাঁদ ভাবিল, সংসারে ইহা অপেক্ষা সন্তোষের আর কি আছে, থাকুক তার বৌ আর ছেলে-পিলে ? তারপর যখন সে সুযোগ পাইল কোনও কাজ করিতে, তখন সে যেন বাঁচিল ; তাই সে কলিকাতা ছুটিল।

নদেরচাঁদ মায়ের উপর বা নিজের অবস্থার উপর রাগ করিয়া কলিকাতায় যায় নাই। কিন্তু তাহার পত্নী মনে করিয়াছিল, স্বামী

মনের দুঃখে দেশ-ত্যাগী হইয়াছেন, যদিও সে স্বামীর বেভোলা-ভাব জানিত। সংসারে স্বামী যে কি হইলে সংসারী হইবে, তাহা কমলা এত দিনেও বুঝিতে পারে নাই। স্বামী, খাইতে হয় তাই খান, ঝগড়া করিতে হয় তাই ঝগড়া করেন, কিন্তু তাঁহার মন যে কোথায়, তাহা পত্নী অনুমান করিতে পারে নাই।

তবুও পত্নী আজ বুঝি ভাবিয়াছে, তাহার স্বামী বোধ হয় প্রকৃতই মনের সাড়া পাইয়াছেন। কমলা তাই যেন একটু স্বস্তি বোধ করিয়াছে। সে ভাবিল—বাস্তবিকই স্বামী যদি একটু উদ্দীপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহার বুঝি এই যন্ত্রণার অবসান হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কমলা স্বামীর জন্য ভাবিল, পাছে স্বামী ক্রোধবশে অন্য গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলেন।

কমলা কয়েকদিন যাবৎ বিশেষ অশান্তিই ভোগ করিতেছিল। নদেরচাঁদ বাড়ী হইতে যাইবার পর হইতে শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী যেন প্রমত্তা হইয়াছিলেন। তিনি মারা হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকার উৎপীড়ন সম্ভব, তাহার একটিও বাদ দেন নাই।

কিন্তু কমলা কি করিবে? তাহার মৃত্যু ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই। বাপের বাড়ীতে সে যে একখানা চিঠি বা সংবাদ দিবে, তাহাও তো এ বাড়ীতে সম্ভব না।

শ্বাশুড়ী সদাকালই নজর রাখিতেন, বধূ কখন কি কাজ করে। অধিকন্তু কাগজের উপর ছাপা অক্ষর বা কালীর দাগ থাকিলে যদি

কোনও মেয়ে-জাতি উহা স্পর্শ করে বা নজর দেয়, তবে ব্রহ্মময়ী তাহাকে বকিয়া উৎসন্ন দেন। তাঁহার মতে স্ত্রীগণের লেখাপড়া শিক্ষা করা পাপ, দেশকে নরকের পথে আগাইয়া দেওয়া। তিনি বলিতেন, মেয়েরা বেশ্যা হয় লেখাপড়া শিখিয়া।

কমলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না সেই দিন প্রাতে যখন নদের-চাঁদ হঠাৎ আসিয়া উঠানে দেখা দিল।

কমলা সে-সময় গোটা কতক চুনো-মাছ, গোটা দুই কই, আর একটা মাগুর বঁটিতে কুঁটিতেছিল, আর হেই হুই করিয়া কাক তাড়াইতেছিল। ব্রহ্মময়ী বোধ হয় তখন ছেঁচি-শাক তুলিতে তুলিতে নিকটবর্ত্তী বাড়ীর ক্ষেত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

নদেরচাঁদ বাড়ীর নামো হইতে উপরে উঠিতেই কমলাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ঐটুকু পথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একলম্ফে সোজাসুজি গিয়া বধূকে বলিল—মা কি তোমায় হাতে ধরে মেরেছিল আমি না আসাতে? যাক, মারে মারুক, ওর স্বভাবই ঐ। দেখ কমলা! কলকাতায় গিয়ে কার্ত্তিকের সঙ্গে দেখা হলো না। কার্ত্তিকের বড়মামার বসন্ত হয়েছিল, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, আর তাড়াতাড়ি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হলো, নইলে দিনকতক সেখানে থাকতাম।

কমলা প্রসন্নচিত্তে হাসিমুখে বলিল—এসেচো, ভালই হয়েচে,

তবে মাকে বলো না যে বসন্তের রোগী তুমি 'নিয়ে এসেচো, মা তা হলে আর এক কাণ্ড বাঁধাবেন।

নদেরচাঁদ বলিল—দেখ কমলা! আমার ওতে ভয় নাই। আমি সংসারে শুধু মার বকাবকির ভয় করি। আচ্ছা, মা না বকে ধরে মার্ত্তে পারে না? লোকে জানলো না, না হয় দু-ঘা খেলেমই বা কমলা! মা ও চালাক হয়েচে। মা বোঝে, মাল্লে ছেলে নষ্ট হয়ে যায়, আর মাও হাতে বেদনা পায়।

ইহা বলিয়া নদেরচাঁদ হাসিল। কমলা বলিল—সে সব কথা পরে হবে। কখন এলে বল দেখি? খাওয়া দাওয়া হয়েচে তো?

নদেরচাঁদ জবাব দিল—কমলা! চারু-দির জন্যে কি না খেয়ে থাকতে পারি? কমলা! চারু-দিকে একদিন তোমায় দেখাবো। দেখবে, যেন পাথরের প্রতিমা। আর স্বভাটাও যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা। ভালবাসে ও তেমনি শীতল করে। কমলা! কলকাতায় এখন বড় গরম। কমলা! যাই মাকে ডেকে আনি।

এই বলিয়া নদেরচাঁদ সন্নিহিত-ঘরের ছাঁচ হইতে মা—ওমা বলিয়া গলায় যত শক্তি আছে, তাই দিয়া ডাক দিল এবং 'আমি এসেচি, শীগগির বাড়ী এসো বলিয়া গগন-পথেই সংবাদ পাঠাইল।

কমলা তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাছের খালই লইয়া ঘাটে মাছ ধুইতে গেল। নদেরচাঁদ মিহি-গলায় সুর ভাজিতে লাগিল—

'পরের জন্যে কাঁদে রে আমার মন'

সে হঠাৎ গায়ের সমস্ত গেঞ্জী, চাদর প্রভৃতি একটানে খুলিয়া বাস্তু-ঘরের চালার উপর ছুঁড়িয়া মারিল। সেগুলি রৌদ্রে পোড়া হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মময়ী দুই তিনটি বাহন সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন—

'কে ডাকলো রে আমায় ? বৌ !'

বধূ কোনও কথা না বলিয়া মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়া শাক ধুইবার ডালাখানা হাতে করিয়া আনিয়া উহা বাড়াইয়া ধরিল। শ্বশ্রূ তাহাতে শাকগুলি মুঠো মুঠো করিয়া তুলিয়া দিলেন।

ও-ঘরে নদেরচাঁদ তখন একটা নারিকেল ছুলিবার কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, সে জবাব দিল—'মা! সে-দিন চারু-দি আমায় খুব খাইয়ে-ছিল। সারাদিনের না-খাওয়া, শরীর কষে গেছলো, চিড়ে, দই, গুড় খেয়ে দেহটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু মা! কাকীমার ভাতগুলি আর খেতে পাল্লেমনা। একটা টেলিগ্রাম এলো।

রান্নাঘরে তখন কমলার মন কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—যা বারণ করেচি, তাই। এমন বুদ্ধি! আবার প্রস্তুত হই, এবারে বুঝি মাথার চুলগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, না তার চেয়ে আরও বড় শাস্তি দিতে পারেন। কি সে শাস্তি ?

নদেরচাঁদ নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া তাহার জলটুকু ফেলিয়া দিল,

কারণ ঝুনো-নারিকেলের জল সুপেয় নহে এবং একখণ্ড নারিকেল হইতে দা দিয়া এক একখানি ফালি সে তোলে আর মুখের মধ্যে দিয়া চিবায়। সে উহা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

মা! গেলাম তো কলকাতায়, কিন্তু যা-ই বল মা! সেখানে কি থাকতে মন টেঁকে? দু-দিন বেশ কাটালুম, শেষে মনে হতে লাগলো, এ দু-দিন যে আমার নির্জ্জলা গেল। মা! যা-ই খাই, তোমার বকুনি না খেলে যে আমার পেট-ই ভরেনা। মা! তোমার পায়ে পড়ি, তোমার সব অত্যাচার সহ্য কর্ব্ব—মার, ধর, কাট, বাঁট, সব সইতে পার্ব্ব, কিন্তু মা! তুমি অত জোরে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে নিও না। মা! এবারে প্রতিজ্ঞা কল্লাম, আর আমি দেশ ছেড়ে কোথাও যাবোনা। এই একবার কলকাতা গিয়ে আমার সাধ মিটেচে। মা! কার্ত্তিক কলকাতায় গিয়ে কি করে কাটাচ্চে? সেখানে তো কেউ কারুর সাথে কথা কয় না। গায়ে ঘেঁষা লাগলে ও চেয়ে দেখে না, কে ঘেঁষা মারলে। সত্যি মা! সেখানে গিয়ে আমার মনটা সব সময় পালাই পালাই কর্ত্ত, আর ভাবতাম—তোমার ক্যাটক্যাটানিই আমার ভাল।

ব্রহ্মময়ীর মেজাজটা তখন ভাল ছিল। তিনি বলিলেন—ঐ যে তোমার হুঁকা নদেরচাঁদ!

নদেরচাঁদ মায়ের হুঁকার খোঁজ দেওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—হাঁ, ভাল কথা, হুঁকাটাকে একটু তেল মাখাই। ইঃ!

জলটা যে একেবারে লোদা হয়ে গেচে! মা! এই কত দিন বিড়ি খেতে খেতে কলজেটা যেন শুকিয়ে যাবার মত হয়েচে।

এই বলিয়া নদেরচাঁদ এক লম্ফে হুঁকাটা লইয়া উহার জল পরিবর্ত্তন করিতে ঘাটে গেল।

সাত

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সুস্থ হইয়া গ্রামের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। তিনরাত্রির অধিক তিনি গ্রাম ছাড়িয়া এযাবৎ বড় বিশেষ থাকেন নাই, তাহাতে কতদিন হইল বাড়ী-ছাড়া। তাই চতুর্দ্দিকের রাশি রাশি কাজ তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। তিনি যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় আজ দুইদিন পাইতেছেন না। ভগিনীর বাড়ীতে তিনি প্রথমতঃ কয়েকদিন কাটাইলেন, সেখানেও বহু লোক তাঁহার সন্ধানে ফিরিত। তারপর তিনি নিজ-গ্রামে গেলেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বৈষয়িক-লোক ছিলেন। প্রজা-জন যথেষ্ট ছিল। তারপর তাঁহার তেজারতী-কারবার ও ছিল, তাহাতে খাতক পত্র বেশ তাঁহার কাছে আসিত, যাইত। প্রজারা ও খাতকরা তাঁহাকে ভয়ের চোখেই বেশী দেখিত এবং পরোক্ষে গালাগালি দিত। বলিত, বামনা চামার, শালা সুদখোর। কারণ ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিত। খাতকরা পায়ে

ধরিয়া, বহু কাঁদা-কাটা করিয়া, চোখের জলে মহাজনের পা ধুইয়া দিলেও তাহাদের একটি পয়সা সুদের মাপ হইত না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ হাইকোর্টের যে মামলার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হারিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনোভাব যে আজকাল কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মামলাটি আজ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। মধুমতী-নদীর পারে যে চড়া উঠিয়াছিল, সেই সম্পর্কে। ব্রহ্মাণ্ডনাথের একটি অদ্ভুত স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—মধুমতী-নদীর যে চড়টিই উঠিত, তাহাই তিনি দখল করিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। এই মতলবানুযায়ী তিনি তাঁহার গ্রামের উত্তরে চারি পাঁচ মাইল ও দক্ষিণে সাত আট মাইলের মধ্যবর্ত্তী মধুমতী-নদীর তীর-সংলগ্ন যত জায়গা আছে, তাহা অধিকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এই চড়া জায়গায় শস্যাদি অতি সুন্দর পর্য্যাপ্ত জন্মে। দরিদ্র মুসলমানরা ঐ স্থানে গিয়া জমি-জাতি পাইয়া বসবাস করিতে ভালবাসে ও জমিদারকে বেশ খাজনা দেয় এবং জমি বন্দোবস্ত, নাম-পত্তন বাবদ মোটা টাকা সেলামী প্রদান করে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথের এই বুদ্ধি করিয়া বেশ সম্পত্তি হইয়াছে ও অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে গিয়া আবার তিনি চরিত্রটাও খুনী করিয়াছেন, কারণ কথায় কথায় ফৌজদারী, খুন, জখম, দেওয়ানী, লাঠিয়ালী না করিতে

পারিলে এইরূপ রাজ্য-বিস্তার হয় না। এই বাবদ যে টাকা ঢালিতে হয়, সম্পত্তি লাভ হইলে তাহার আট দশ গুণ ফিরিয়া পাওয়া যায়। এই করিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথের নাম হইয়াছিল—'ডাকাত-ব্রহ্মাণ্ড।'

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ গা-ঢাকা দিয়া থাকিতেই চাহিতেন। এবারে আর তাঁহার সে-বিক্রম খাটিবেনা, যে নিজজমির সংলগ্ন বা দূরবর্ত্তী চড়া মাথা তুলিয়া উঠিলেই তাঁহার হইবে এবং তিনি বলিবেন—ও চড় তো বহুদিনের,নূতন ওঠে নাই। তিনি অবশ্য দেশে আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাঁহার মায়ের দয়া হওয়াতে এ তারিখের মামলায় হাইকোর্টের জজের কাছে তিনি সময় লইবার প্রার্থনা জানাইয়া মামলা মুলতুবী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে হারিয়া গিয়াছেন, ইহা কতদিন চাপা থাকিবে ? বিপক্ষগণ যে শীঘ্রই 'ইনজাংসন', ঢ্যাডরা পিটাইয়া জারি করিবে। ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্প তখন চূর্ণ হইবে না ?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ আজকাল দেশের জনহিতকর কার্য্য লইয়া বড়ই লাগিয়া পড়িয়াছেন। কারণ উহাই যে এখন তাহার সান্ত্বনা। সাধারণ লোকে যাহাতে তাহার প্রতি বিষকটাক্ষ না ফেলিতে পারে, তাহার জন্যই যে এখন উঁহার চেষ্টা।

তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত স্নান-আহারাদি

কার্য্য সারিয়া প্রথমেই নবীন-ডাক্তারের আড্ডায় যাইতেন এবং দেখিতেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে রীতিমতে ঔষধপত্র দান করা হয় কিনা। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছিতেই বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রোগের রোগী আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এ বলে – ডাক্তার বাবু অসুদ দেয় না। ও বলে—আজ তিন মাস যাবৎ ম্যালোয়ারীর তেঁতো-জল গিলচি, রোগ সারে না। অন্যে বলে—নবীন-ডাক্তার টাকা না পেলে, ভাল রংয়ের মিটচার দেয় না। কেহ বলে,—অসুদই নাই, দেবে কি? এইরূপ বহু আবেদন-নিবেদন, আসামী-ফরিয়াদী, সওয়াল-জবাব, রায় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথের বাড়ী ফিরিতে বেলা হেলিয়া যাইত; তারপর তিনি বৈকালের দিকে দুই এক জন দেশীয় পাইক বরকন্দাজ লইয়া রাস্তা-ঘাট, খোঁয়াড়, খেয়া-পাট প্রভৃতি দেখিতে যাইতেন। এবং সেখানে এক প্রহর সময় কাটাইয়া দেশের হিতকর কার্য্য করিতেন, অর্থাৎ কতগুলি বাজে লোক-দেখানো কাজে থাকিতেন। আবার প্রতি রবিবার য়ুনিয়ন বোর্ডের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিতেন। তাহাতে লোকের সাজাই হইত, উপকার যে কিরূপ হইত, তাহা দেশের লোকেই ভাল বলিতে পারে; ব্রহ্মাণ্ডনাথ তাই তত্রত্য লোক-দৃষ্টিতে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

কিন্তু এদিকে যে তিনি অরুন্ধতী ও চারুর তাগীদের উপর তাগীদ শুনিয়াও এ বাড়ীতে আসিয়া এই উদ্বিগ্না নারী দুইটিকে

বিস্তারিত সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবেন, ইহা তাহার সময়ে কতদিনই কুলাইতেছে না। আজ সকালেও নদেরচাঁদ আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে— বড়মামা! অবশ্য করে আজ যাবেন, কাকীমা আমায় বকেন। চারু-দি তো বলেন— 'নদেরচাঁদ কি বুড়ো-বুড়ি পোড়াচ্চ? আমায় বুড়ী বানাও।'

বড়মামা আজ স্থির করিয়াছেন, ভগিনীর বাড়ীতে যাইবেন। কিন্তু সেখানে যাইবেন কি? তিনি ঐ ব্যাপার মনে করিয়াই যে রাগিয়া অস্থির। ঐ ব্যাপারই নাকি তাঁহাকে মামলায় হারাইয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তাই রাগে গড়গড় করিতেন। তিনি এতাবৎ বহু চিন্তা করিয়াছেন, কিসে ইহার প্রতিবিধান করা যায়। যে কারণ তাঁহার মামলা হারাইল, তাহা কি উপায় অবলম্বন করিলে সমূলে বিনষ্ট করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ মনে মনে বলিলেন—যদি ঐ অপয়া মাগীটাকে চোখের জলে, নাকের জলে করা যায়, তবে আমার সাধ মেটে, ও মাগীটার পোড়া নিঃশ্বাস গায়ে লেগে কার্ত্তিক ছোড়াটা নিরুদ্দেশ হলো, আর আমিও জীবনে এই নূতন মামলায় হারলাম।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ মনে মনে রাগিয়া বলিলেন—চেন না মণি! তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে। এ মাটিতে আর তোমার স্থান হবে? মনেও তা জায়গা দিও না। যে-টাকে নিয়ে বেরিয়েছিলে, সে-টা তো মরেচে,

এখন আরও একটাকে জুঠয়ে নাও। তার কি আর অভাব আছে ?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তখনই অরুন্ধতীর বাড়ী রওনা হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া জলযোগ করিয়া চাদর-টা গলার দুইধারে ঝুলাইয়া, কাপড়টার কোঁচা দো ভাঁজে গুঁজিয়া একখানা মোটা বাঁশের লাঠির মাঝখানে ধরিয়া রওনা হইলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি পান চিবানের কাজটা শেষ করিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যখন ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন বেলা পাঁচটা। চারু তখন কতগুলি বোরো-ধানের গুমা-খড় অর্দ্ধ-শুষ্ক-অবস্থায়ই একজায়গায় জড় করিতেছিল। বড়মামা পৌছিতেই সে সেই কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া বিস্তীর্ণ উঠানটি একতাড়া ঝাঁটা দিয়া ঝাঁড় দিয়া ফেলিল। সে দ্রুতপায়ে গিয়া ঘর হইতে একটি বেতের মোঁড়া আনিয়া বড়মামাকে ঘরের হাতিনায় পাতিয়া দিল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ কিছুকাল অরুন্ধতীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে আলাপ করিতেছিলেন।

অরুন্ধতী বলিলেন—দাদা! শরীরটা ভাল হয়েচে ?
ব্রহ্মাণ্ডনাথ জবাব দিলেন—হাঁ, ভাল হয়েচে, তবে বড়ই চুলকনায় ধরেচে।

অরুন্ধতী পুনরায় বলিলেন—তেঁতো খাও, নিমপাতা-ভাজা খাও। এখন এই চুলকণা ভাল হয়েই গেলে শরীর ভাল হতে

আরম্ভ কর্বে। বসন্তের পর চুলকণা হয়, তা ঐ চুলকনা সারলে ধরধর করে শরীরের পানোক ফেরে। ঐ সেবার গাঙ্গুলিমাষ্টেরের হয়েছিল, সেরে গেল, দু-দিনে আবার আগের শরীর হল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভাগ্নী-প্রদত্ত মোঁড়ায় আর বসিলেন না। দুই ভাই-বোনে আলাপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। চারুর খাটুনি যেন ভয়ানক জোর হইল। তাহার ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাটা দিয়া, রান্নাবান্না সারিয়া স্থির-চিত্তে গল্প শোনে। হইল ও তাই।

চারু বলিল--বড়মামা! রান্না হয়ে গেল বলে, মাছের ঝোল আর ভাত; খড়ে জ্বাল দোবো। হতে কত ক্ষণ? আপনি আগে কিছু বলবেন না। আমি রান্না সেরে আসি, বড়মামা!

বড়মামা কথা বলিবার পূর্ব্বে মাতা বলিলেন—পাগলী ঝড়ের মত খাটচে। বড়মামা মাথা নাড়িয়া ভগিনীর কথায় সায় দিল। অরুন্ধতী বলিলেন—

চারু! ঝোলটা যেন ভাল হয়। তোর বড়মামা কিন্তু খারাপ রান্না খেতে পারে না।

চারু বলিল—বড়মামা! খাওয়া হবে তো গল্পের পরে?

ব্রহ্মাণ্ড নাথ উত্তর দিলেন—হাঁ তাই, তুই রান্না সেরে আয়।

অরুন্ধতী ও চারু শুনিয়াছিলেন, কার্ত্তিক আসিল না। কিন্তু সে যে নিরুদ্দেশ, ইহা তাঁহারা শোনেন নাই। তাঁহারা এখন তাহা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিতা হইলেন এবং তাঁহাদের আর কোনও

কথা ভাল লাগিল না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাঁহার ক্রোধের মহলা দিতে বসিলেন।

ইত্যবসরে গাঙ্গুলি মাষ্টার তাহার সায়ং-ভ্রমণচ্ছলে চারুদের বাড়ী আসিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডনাথকে দেখিয়া বলিলেন—আপনি কবে এলেন? শরীর তো একেবারে খারাপ হয়ে গেচে। কার্ত্তিকের খবর কি?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পূর্ব্বেই উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গাঙ্গুলিমাষ্টারের জিজ্ঞাসিত-কথায় জবাব না দিয়া বলিলেন—দেখ মাষ্টার, কি যে অদেষ্ট! তা আর কি বলবো! এই যে আজ-কালের হালী-ফ্যাসান হয়েচে—'মেয়েদের শেখাও'—এ-টাই দেশটাকে উৎসন্ন দেবে। আমাদের আর তা থাকলো কই? সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রীতি নীতি তা চুলোয় গেল। এই ইংরেজী ধরণের সাজ, ইংরেজী ধরণের আদব-কায়দা, ইংরাজী পড়া, ইংরাজী চালচলন, ইংরাজী প্রেম—সবই হচ্চে এই পুরাণো হিন্দু সমাজটাকে নরকের পথে টেনে নেওয়ার ফন্দী। হা রে! দেশ কি আমাদের তেমন? এ হলো গরম দেশ, এখানকার লোক ভাবপ্রবণ। ঐ যে শুনেচি, বিলেতের মেয়েরা খেলে, বেড়ায়, পড়ে, চাকরি করে, সবই পুরুষের সাথে, কিন্তু কই তাদের ভেতর তো এত হক না হক প্রেম হয় না? তারা মেয়ে-পুরুষে মনে করে সঙ্গী-সঙ্গিনী। এ রকম নিয়ম তাদের বহুদিন থেকে চলে আসচে, আর চিরকাল চলবে। সে-দেশের আবহাওয়া,

সে-দেশের পারিপার্শিক অবস্থা, সে-দেশের অতি শীত, সে-দেশের অর্থের স্বচ্ছলতা, সে-দেশের চালচলন সবই যে সে-রকমে বাঁধা। সে-দেশের বিয়ে হয় এক একটা মেয়ের কুড়ি পঁচিশ বরং তার চেয়ে বেশী বয়সে, কিন্তু সে-দেশে কি এমন হয়, যে তের চৌদ্দ বছরের মেয়েদের উপর আঠার কুড়ি বছরের ছেলেদের একদৃষ্টে চেয়ে থাকা? আজকাল কলকাতায় বেশী বয়সে মেয়েদের বিয়ে সুরু হয়ে এক রকম মজা হয়েচে। মেয়েরা এখন বড় হয়ে রাস্তায় বেরোয়, আর কি না ছেলেগুলোর মহাপর্ব্ব। এতদিন তাদের কোনও বয়সের-মেয়েকে দেখতে ঘরের জানালায়, কি খেঁাপরে, কি ছাদে, কি গঙ্গার ঘাটে, ওঁৎ পেতে থাকতে হত, এখন আর তা হয় না। এখন একটা মেয়েদের স্কুল ছুটি হলেই হলো, বা বিকেলে রাস্তায়, কি সকালে পার্কে গেলেই হলো। কত নভেলীয়ানা হয় সেখানে! আর দেখ বিলেতে, সেখানে ও-সব কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। হাঁ, তবে এই মেয়েদের রাস্তায়, ঘাটে, স্কুলে, মাঠে, দোকানে—সব জায়গায়ই যখন এই ছেলেরা সব সময় বিলেতের মত দেখতে পাবে, তখন আর এই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানো থাকবে না। তবে আশা করা যায়, এ-পরিবর্ত্তন অবশ্য শীগগিরই এ-দেশে হবে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি, এই শুভ-কর্ম্ম হবার প্রারম্ভেই যে আমাদের সর্ব্বনাশ। কালিয়া জায়গাটা অত্যন্ত শিক্ষিত, সভ্য, আগুতি কিনা, তাই বৌটিও আমাদের তাই

হয়েচেন, সমাজের শুভাদৃষ্টের ফল দেখিয়েচেন, সঙ্গে সঙ্গে আমারও কপাল পুড়িয়েচেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে সমস্ত কথা বলিলেন, গাঙ্গুলি মাষ্টার তাহাতে মাত্র সায়ই দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট-মহাশয়ের কোনও কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলে প্রেসিডেণ্ট মহাশয় বিশেষ চটিয়া যাইতেন। সুতরাং গাঙ্গুলি-মাষ্টারমহাশয শুধু ব্রহ্মাণ্ডনাথের কথাই শুনিয়া গেলেন।

গাঙ্গুলি-মাষ্টার বলিলেন—বড়মামা! বৌমা কি করেচেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিকৃত ভঙ্গিমায় বলিলেন—তিনি শিক্ষার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েচেন। গ্রামের নাম রেখেচেন। তিনি যে ভয়ানক অগ্রসর তাইই প্রমাণ করেচেন। আরও কি করেন জানি না।

চারু সতৃষ্ণনয়নে ব্রহ্মাণ্ডনাথের পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—

বধূমাতা একটু প্রেমে পড়েচেন। বিমান বলে ঐ যে একটা ছোঁড়া ছেলো, যার কথা তোমাদের কাছে বলেচি—তিনি তারই জন্যে যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেচেন।

চারু জিহ্বা দন্তে কাটিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিতেই লাগিলেন—

গাঙ্গুলি! আমাদের সে-শিক্ষা কই? দেশের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তা আমাদের শিক্ষা-নিয়ন্তৃদের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কথা বলাই

ধৃষ্টতা। তাঁদের সব বড় মাথা, বড় বুদ্ধি। আমরা মূর্খ। তবে এটা বলা যেতে পারে, যে শিক্ষায় শুধু নভেলীয়ানা এনে দেয়, বিলাত ভাব-ধারার এক অংশ অনুকরণ কর্ত্তে প্ররোচিত করে, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়—তা ছেলেদেরই হউক, আর মেয়েদেরই হউক। আমাদের আগেকার বাল্য-বিবাহ, যথা, গৌরীদান যেমন শিশুমৃত্যুর, বৈধব্যের সৃষ্টি কর্ত্ত, তেমনি এই পাশ্চাত্য-শিক্ষা মেয়েদের নিঃশেষ করে, মাতৃত্বটুকু কেড়ে নিয়ে অসার-সঙ্গিনী যক্ষ্মা-জননী কচ্চে। সত্যি আমার দুঃখু হত, কলকাতায় যখন বৈকালে স্কুল-ফেরৎ মেয়েদের পানে তাকাতাম। দেখতাম, অমন কোমল-কান্তিদের মুখগুলি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেচে, শুধু তারা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্চে, স্কুলের গাড়ীতে মিহি-সুরে কথা কইচে, যেন ছ-মাসের রোগিনী। হাঁ, বুঝি, দেহের উপর এই দৌরাত্ম্য করে, তাদের প্রেমের স্পৃহা কমিয়ে, ইন্দ্রিয় সংযম শেখান হচ্চে, কিন্তু তাতে যে নবনী-তোলা-দুধের চিনি-পাতা-দই হয়, তা কি সমাজ-শাসকরা বুঝচেন না? সেই মনঃসংযম করে যে ইন্দ্রিয়-সংযম, তা বা কি জিনিষ? আর ঐ যে কি বই বলে—কাব্য, উপন্যাস, পড়িয়ে, ইন্দ্রিয়োৎক্ষিপ্ত করে, শুকিয়ে খেতে না দিয়ে, জিতেন্দ্রিয় করা বা কি জিনিষ? ইংরাজীতে যাকে বলে 'বার্থ-কনট্রোল'—অর্থাৎ জন্ম-রোধ, তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপায় আপনিই হবে, এজন্য আর চেষ্টা করে সন্তান জন্ম-বদ্ধ কর্ত্তে হবে না।

এ-টা হচ্চে সে রকম, ঐ যে একজন বলেছিল—আমরা পাঁচ ভাই আছি, পাঁচখানা ঘর লাগে; কত দড়ি, বাঁশ, খড় বছরে আবশ্যক হয়, একটা তুইটা ভাই মরে যেত, একখানা তুখানা ঘর কমিয়ে দিতাম, তাতে কম দড়ি, বাঁশ, খড় লাগতো। কিন্তু সে মূর্খ বোঝে না, যে এই পাঁচ ভাই রোজগার কল্লে, পঁচিশখানা ঘর হতে পারে। কিন্তু সে রোজগার করে কে? শরীর শুকিয়ে শুক-দেবের সৃষ্টি করা ভাল, না দেহ পুষ্ট করে জনক-রাজা হওয়া ভাল?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে-সমস্ত কথা বলিলেন, গাঙ্গুলি-মাষ্টার তাহাতে কেবল সায়হ দিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের কোনও কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলে প্রেসিডেণ্টমহাশয় চটিয়া যাইতেন। সুতরাং গাঙ্গুলি-মাষ্টারমহাশয় শুধু ব্রহ্মাণ্ডনাথের কথাই শুনিয়া গেলেন।

অরুন্ধতী বা চারু এই কথাবার্ত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন—সে বউটা তা হলে খারাপ হয়ে গেচে?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—তা একেবারে গেচে।

অরুন্ধতী জবাব দিলেন—তবে কার্ত্তিকটাকে খুঁজে-পেতে আনলেই ভাল হতো।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ কার্ত্তিকের নামে তখন হাসিলেন। তিনি হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দেখ অরু! সেইটার ওপর আমার হাসিও পায়, রাগও হয়। ঐ বিমানটা যখন বসন্তে মারা-

গেল, আমারই তো তাকে দাহ কর্ত্তে হলো। আমি কার্ত্তিকটাকে তো নিয়ে কাশীমিত্তিরের ঘাটের শ্মশানে গেলাম, সেইটা তখন বললে —বড়মামা। আমি দিদির কাছে, বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি, নৈলে তারাও যদি বিমানবাবুর মত ক্ষমা না করে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। এই কথা বলে কার্ত্তিকটা যে গেল, আর এলোনা। মাষ্টার! আমি বুঝচি, কার্ত্তিকের ভাবনা নাই, সে কলকাতা-সহরে দিদি-বৌদি যোগাড় কর্ত্তে পেরেচে, আমাদের বধূমাতা সাধিকা দেবীর মত কারা যেন আমাদের গুণধর পুত্রের আঁঠায় জড়িয়ে গেচেন। আর অরু! তোমার ছেলের খাওয়া থাকার ভাবনা কি? তবে এখন শরীরটায় সুস্থ থাকলে হয়। বসন্ত থেকে উঠেচে, শীগগির আর তার এ কালের রোগের ভয় নাই। আমি মাষ্টার! বুঝি না, এ পাগলের প্রেমে কে পড়লো?

চারু-দি বলিল—বড় মামা! তুমি শুধু খারাপটাই ধর। কার্ত্তিককে সবাই ভালবাসে, কারণ সে বড় সরল। ক্ষেপাটে কিন্তু পাগল তো নয়। সে কারুর দৃষ্টিতে পড়বে কেন?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ চারুর কথায় হুঁ করিলেন। তিনি বলিলেন— আমি ও-কথা ঠাট্টা করে বলেচি। তুই কিছু মনে করিস না চারু! কিন্তু তা তো হলো, মামলাটায় হেরে গেলাম, কি যাত্রা করেই যে বেরুয়েছিলাম, তা আর বলার নয়।

অরুন্ধতী তখন বারম্বার দাদাকে কলিকাতার ঐ ব্যাপারের

বিস্তৃত বিবরণ বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথও তাহা বলিলেন।

শেষে অরুন্ধতী বলিলেন—দাদা! কার্ত্তিক যখন আসত, আসত, কিন্তু বৌমাকে তুমি নিয়ে এলে না কেন? নদে তো তোমাকে ও বৌমাকে একসঙ্গে আনতে পার্ত্ত।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—আমার শরীরে একফোঁটা রক্ত থাকতে অমন কুলটাকে বাড়ীতে আনবো? ওকে তো ত্যাগই করেচি। ফিরে কার্ত্তিককে বিয়ে দোওয়াব; তার তো কাঁচা বয়স। ঐ বেশ্যাকে ঘরে এনে সংসারটাকে নরক বানাবো? ওকে ঘরে আনলে যে সমাজে পতিত, একঘরে হয়ে থাকতে হবে। তা জান অরু?

বড়মামার এই কথায় সব চেয়ে বেশী যে ব্যথা পাইল, সে চারু। সে ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিল। 'অমন অল্প বয়সের মেয়েকে ত্যাগ! তা হলে যে হতভাগিনী আরও ডুবে যাবে।'

সে চুপ করিয়া থাকিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি একবার বড়মামার মুখের পানে, আর একবার মায়ের চোখের পানে পড়িতে লাগিল।

অরুন্ধতী দাদার দৃঢ়স্বরে ভীতা হইয়া বলিল—তা দেখ, তোমার যে মত হবে, তার বিরুদ্ধে তো কোনও কথা বলতে পারি না, বা বলতে সাহস করি না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুনরায় তারস্বরে বলিলেন—

এমন বলবে এ আশপাশের গ্রামে কার কটা মাথা আছে? মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দোবো না? তবে অন্যায়ের পক্ষপাতী ব্রহ্মাণ্ড নয়। ন্যায় কথা বলো, জুতো মাথায় বইবো, অন্যায় বল, ঐ জুতো মাথায় মারবো। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমার ভাগ্নে-বউ, তুই কিনা গ্রামের, কে না ধর্ম্মসম্পর্ক পাতিয়েছে, তার সাথে গিয়ে কলকাতায় বাসায় থাকিস? আর লোকে বলবে—ব্রহ্মাণ্ড! তোমার ভাগ্নে-বউ বাজারে-বেশ্যা! অরু! অরু! ডুবে গেলাম! কালিয়া সভ্য-জায়গা—এখানকার মেয়ে এনে আমার সংসারটা রসাতলে গেল! আর দেখ অরু! দোষ ঐ মাগীর মার। তুই একলা যেখানে যাবি যা, মেয়েকে নিয়ে যাস কেন্? মেয়ে বিয়ে দিয়েচিস, মেয়ে পরের হয়েচে, তোর সে মেয়ের উপর কি হাত? তা মাগী মেয়ে শুদ্ধ নিয়ে গিয়ে বাসায় ঢুকেচে। ঐ বিমান যেন তোর সাত জন্মের জামাই। তবে মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেই পার্ত্তিস? কার্ত্তিককে জামাই পছন্দ না হয়ে থাকে, মেয়েকে নব-গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মার্ল্লে পার্ত্তিস। তার সঙ্গে আর একটা বংশকে ডুবাস কেন? অরু! আমার রাগ যেন কিছুতেই কমচে না। আজ তো কম দিন হলো না। সেই কলকাতায় ঐ বাসায় যাওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত, আমি যেন রাগে পুড়ে ছাই ছাই হয়ে যাচ্চি। তা এতদিন কাউকে বলতে পারিনি, আজ বললাম।

দেখ অরু! আমি এর রীতিমত ব্যবস্থা কর্ব্ব, তবে আমার মনে শান্তি আসবে, নইলে এ রাগ ক্রমেই বাড়বে।

অরুন্ধতী বলিলেন—দাদা! এই নিয়ে বাজাবাজি কল্লে আরও ছড়াবে না? থুতু উপরের দিকে ফেললে যে নিজের গায়েই লাগে। এতে আমাদের মুখে চূণ কালী আরও পড়বে না?

ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—বাজাবাজি আর কি? প্রতিশোধ কি করে নোবো, তাই-ই এতদিন ভাবচি। এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। অরুন্ধতীও নীরব রহিলেন।

চারু কি যে ভাবিবে বা করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতে-ছিল না। সে যে বড়মামার ক্রোধের তর্জ্জন গর্জ্জন বিশেষ শুনিতেছিল, তাহাও মনে হইল না। সে শুধু অপলকনেত্রে চিন্তা করিতেছিল বৌদির অবস্থা। এবং কল্পনায় বৌদির ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি কি হইবে, ইহা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল। ইত্যবসরে ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—গাঙ্গুলি। কটা বাজে?

গাঙ্গুলি-মাষ্টার উত্তর করিলেন—প্রায় দশটা! যাই, আমিও উঠি।

এই বলিয়া মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইলেন। তাঁহার অনেক বক্তব্য থাকিলেও তিনি মনে মনে তাহা চাপা রাখিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড চারুর দিক ফিরিয়া কহিলেন—চারু! দুটো খেতে দে।

চারু তন্মুহূর্ত্তে উঠিয়া কোনও কিছু না বলিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল এবং দেশলাই দিয়া কেরোসিনের ডিবাটি ধরাইয়া ঢাকা-ভাত ও মাছের ঝোল বাড়িতে লাগিল। সে তাহার হাতের কাজ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন যে কোথায় ছিল, তাহা সে-ই জানে না।

চারু চলিয়া গেলে দুই ভাই-বোনে কিছুকাল আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার সারাংশ ইহাই ছিল—চারু বোধ হয় দুঃখিতা হইয়াছে।

চারু ভাবিতে লাগিল—বড়মামা হয় ত মিথ্যা করিয়া অভাগীকে দোষী করিতেছেন। তিনি হয় তো বৌদিদের কোনও ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছেন। বড়মামাকে আদর-যত্ন করিতে হয় তো তাঁহারা ত্রুটি করিয়াছেন, আর না হয় বড়মামা হাইকোর্টে মামলা করিতে গিয়া হারিয়া গিয়াছেন এবং এই কার্য্যের প্রাক্কালে ঐ ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাই এই হতভাগ্যদের উপর দোষ চাপাইয়া দিতেছেন। চারুর সে-হেতু নিতান্ত ইচ্ছা হইল, কি করিয়া এই অজ্ঞাত-বিষয় সম্যক জানিতে পারে। সে কোনও মতে রাজী হইতেছিল না, যে তাহার ভ্রাতৃ-বধূ চরিত্রহীনা।

চারু মনে মনে তাহার বড়মামার বিরুদ্ধে অনেক নজীর পাইতে লাগিল। সে ভাবিল, বড়মামা যে সেকেলে-মতের তাহা তো

তাঁহার কথায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। তিনি নব্যতন্ত্রের নন। পুরাতন যাহা কিছু সবই তাহার উৎকৃষ্ট। পুরাণো শিক্ষা, সমাজ, চালচলন যাহারা ভাল বলে, তাহাদেরই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দেন। কিন্তু তিনি মোটেই মানিয়া লইতে স্বীকৃত নন যে দিনের পরিবর্ত্তনে সমস্তের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কার্ত্তিকের বধূ হয় তো আধুনিক কিছু হাবভাব দেখাইয়াছে, তাই তাহার উপর তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন।

চারু আরও ভাবিল—সাধিকা দেশের লোকের বাসায় গিয়া আছে, তাহাতে কি এমন গুরুতর অপরাধ হইয়াছে যে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে! সেই দেশের লোক বিমান বাবু যদি প্রকৃতই সৎ ও আপন হন, তবে বিশেষ কিছুই গর্হিত কার্য্য করা হয় নাই।

বড়মামা আহারান্তে গিয়া মাতার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে চারু আকাশপাতাল ভাবিতেছিল। সে শেষে স্থির করিল—এ বিষয় বিস্তারিত না জানিয়া শুনিয়া ভ্রাতৃবধূকে সে দোষী সাব্যস্ত করিবে না। সে মনে মনে বলিল—হাঁ, যদি বিমানবাবুই খারাপ হন, আর কার্ত্তিকের বৌ যদি ভাল হয়, তবে সেই বিমানবাবু কি করিতে পারেন? চারু মনস্থ করিল—এ বিষয় সে নন্দেরচাঁদের সঙ্গে আলাপ করিবে। নন্দেরচাঁদ তো কলিকাতা গিয়াছিল, সে হয়তো এ বিষয় কিছু শুনিয়া থাকিবে। কার্ত্তিকের বউয়ের সম্বন্ধে সে কিছু আর বানাইয়া বলিবে না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভগিনীর সহিত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়া চারু বলিয়া ডাক দিলেন।

চারু রান্নাঘর হইতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ডাক শুনিয়া বলিল—যাই।

চারু আসিলে ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—একখানা চিঠির কাগজ ও খাম দে তো।

চারু উহা কি জন্য লাগিবে তাহা জানিতে না চাহিয়াই বড় মামার নির্দ্দেশ মত তোরঙ্গ খুলিয়া চিঠির কাগজ ও খাম আনিয়া দিল এবং দোয়াত কলমও দিতে ভুলিল না।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা পাইয়া লিখিল—

৺শ্রীশ্রীদুর্গা মাতা সহায়

যাত্রাপুর (যশোহর)

১লা চৈত্র।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা বৈবাহিকা-মহাশয়াষু,

সম্প্রতি নিবেদন এই, আপনার কন্যাকে আমরা আর আনিব না। আপনি হয়ত আমাদের পত্রের অপেক্ষা করিয়া আপনার কন্যাকে আরব্ধ-কার্য্য হইতে সংযত ও নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনার সে-চেষ্টা করা বৃথা। প্রকৃতি দুর্দ্দম।

আমাদেয় ভয় আপনার করা অনাবশ্যক। আপনার আত্মীয়তা আমরা প্রত্যাহার করিলাম। ইতি—

নিবেদিকা

বৈবাহিকা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ অরুন্ধতীর জবানী এই পত্রখানা লিখিয়া উহা পাঠ করিলেন, অরুন্ধতী উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিলেন। চারুর মনটা তখন যেন বাতাসে-নড়া-পাতার মত কাঁপিতেছিল। সে একমনে উহা শুনিয়া আর যেন দাঁড়াইয়া রহিতে পারিল না। সে পুনরায় রান্নাঘরে গেল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ উহা লিখিয়া খামে আঁটিয়া শিরোনামা লিখিলেন। অরুন্ধতী যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন! ব্রহ্মাণ্ডনাথ বলিলেন—কাল সকালেই চিঠিখানা ডাকে ফেলতে হবে।

আট

বৈবাহিকার পত্র পাইয়া বৈবাহিকা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই তিনদিনের মধ্যে দিবারাত্রিতে অতি কম মুহূর্ত্তই সেই তক্তপোষ হইতে নীচে নামিয়াছেন। নেহাৎ যাহাতে

কক্ষের বাহির হইতে হয়, তাহাতেই মাত্র ঘরের বাহির হন। তিনি এ কয়েকদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিট কালও নিদ্রা বোধহয় যান নাই। একেই ইন্দুমতীর অনিদ্রার অভ্যাস ক্রমেই বাড়িতেছিল, তাহাতে এই ব্যাপারে সে-অভ্যাসটি ষোল আনায় পূর্ণ হইল। তিনি যে সমস্ত সময়ই চোখের জল ফেলিতেছিলেন, তাহাও নহে, শুধু একচোখে ছাদের কড়িকাঠের দিকেই তাকাইয়া থাকেন।

ইন্দুমতী বড়ই আশা করিয়াছিলেন, যে বৈবাহিক এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। যদিও তিনি সে-দিন ব্রহ্মাণ্ডনাথের আকার ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তথাপি তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে এই বর্ষীয়ান লোকটি অন্ততঃ মানুষের বিপদ গণিয়াও এরূপ কার্য্য করিবেন না। ইন্দুমতী তাই ব্রহ্মাণ্ডনাথের এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি এখন স্থির বুঝিলেন, বাস্তবিকই তাঁহারা নিরাশ্রয়।

ইন্দুমতী এই চিঠিখানা পাইবার পর হইতে উহা যে কতবার শুনিয়াছেন, তাহা গণিয়া অবশ্য তিনি রাখেন নাই, তবে উহার বার বার আবৃত্তি শুনিয়া যেন তাঁহার সমস্ত কথা কয়টি একরূপ মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি উহা যতই মনে ভাবেন, ততই যেন একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি মনে মনে বলিলেন—ভগবান! তুমি কার? তুমি অসহায়ের? না, তুমি

কখনও বিপন্নের নও। যে সম্পদে তোমায় ডাকে, সে-ই তোমার কৃপালাভ কর্ত্তে সমর্থ হয়। এই কতদিন যাবৎ আমি এক-মনে এক-প্রাণে তোমায় ডাকচি, ইহাই কি তাহার পুরস্কার?

বাস্তবিক ইন্দুমতী রমেনের এ-বাসায় উপস্থিতি ও অবস্থিতি অবধি সদাকাল এত ভক্তিগদগদভাবে ঈশ্বরের পদে করুণা ভিক্ষা জানাইতেছিলেন, যে তাহা বোধ হয় বিমানের জীবিত কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং বিমানের মৃত্যুর পর নিরবলম্ব্য হইয়াও এত আত্মনিবেদন সর্ব্বনিয়ন্তাকে জানান নাই, কারণ এই বাসাটির আকাশ বাতাস ক্রমেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল। যেন একটা স্বৈরাচারিতা অহর্নিশ এই বাড়ীটির উপর রাজত্ব করিতেছিল।

ইন্দুমতী অবশ্য একটু সময়ের জন্যও তাঁহার কামড়া ও তক্তপোষ ছাড়িয়া কোনও ব্যাপারে যাইতেন না, কিন্তু তিনি ওখানে বসিয়া, শুইয়া এই আবহাওয়ার প্রতি নাড়ী-নক্ষত্র জলের মত পড়িতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার কোনও কষ্ট হইত না।

তিনি ইহা প্রত্যক্ষ বুঝিয়া দিবারাত্র মনে করিতেন, ময়নাটাকে কোথাও নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারিতাম, অথবা তাহাকে বুকের ভিতরে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইত, অথবা ময়নার কলেরা হইয়া সে তিন ঘণ্টায় মারা যাইত। ইন্দুমতী মেয়েকে ক্রমেই চিনিতে ছিলেন এবং তাহার বিষয় যে গরীমময়ী ধারণা ক্রমশঃ

জন্মিতেছিল, তাহা নিশ্চিন্ততার কারণ যথেষ্ট হইলেও, এরূপ আব-হাওয়ায় কোনও বর্ষীয়সী রমণীর থাকা কোনও মতে অভিপ্রেত নহে।

ইন্দুমতী এই দুর্দ্দিনে যাহাকে এক মাত্র সাথী পাইয়াছিলেন, সে যে দিনদিনই গোঁদের উপর বিষ ফোড়া প্রমাণ করিতেছিল। ইন্দুমতী সেই কবির ভাষায় মনে করিলেন—'যেই ডাল ধরি আমি, ভাঙ্গে সেই ডাল।

বিমানের জীবিতাবস্থা হইতে রমেনের উপর ইন্দুমতীর যে এক ক্রুর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি এযাবৎ অপসারিত করিতে পারিতেছিলেন না, যদিও রমেনের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ অভিযোগ এযাবৎকাল হাতে-নাতে পান নাই। কিন্তু এবিষয় তিনি সদাক্ষণ সতর্ক থাকিতেন।

ইন্দুমতীর সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তা হইয়াছিল সুবর্ণকে লইয়া। তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া হিন্দুসমাজের প্রতি ধিক্কার দিলেন। কেন আজকালকার এ-দেশীয় বয়সের ছেলেরা জোর করিয়া, দাঙ্গা করিয়া বিধবা-বিবাহ এ-দেশে প্রচলন করে না। তাহা হইলে এরূপ সুবর্ণের সৃষ্টি হইত না। হৃদয়কে উপবাসী রাখিয়া ভগবানের আরাধনা করা বৃথা আড়ম্বর মাত্র। মনের দেহের উপর অধিকার না থাকিলে, দেহ তো যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেই, ইহা দেহের ধর্ম্ম। আমি ক্ষুধিত, আমি আহার করিতে চাহিব, ইহা তো অতি

স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়-সংযম না শিখিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয় সংযত করিব? মূষিকের তৃপ্তি গর্ত্তে, সে তো সে-দরজায় প্রবেশ করিতে যুদ্ধ করিবেই! পূর্ব্ব হইতে সেই কক্ষের আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া চূর-মার করিয়া দ্বারে কণ্টক আরোপিত কর, তবে আর সে সেখানে যাইতে লোভ করিবে না। ইন্দুমতী মনে মনে বলিলেন, ও সব টিকি-ধারীর চেষ্টায়, শাস্ত্রের বচন আওড়ানে চলিবে না। চাই, এই দেশের যুবকদের, যাহারা কোন নজীরের ধার ধারিবে না, যাহা তাহাদের মনের উপর তীব্র দাগ কাটিবে তাহা তাহারা করিবেই, তাহা যতই আচার-বিরুদ্ধ, সমাজ-বিরুদ্ধ হউক না কেন? তাহা না হইলে বিধবা-বিবাহের এদেশে চলন হইবে না।

ইন্দুমতী যতই সুবর্ণের ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে দেখিতেন, ততই তাহার দুঃখ হইত। কিন্তু বারেকের জন্য তিনি সুবর্ণকে দোষী করিতেন না।

বেচারীর বিবাহের দশ দিনও পার হইয়াছিল না, তখন স্বামী মারা গিয়াছিল। স্বামীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। তারপর গৃহে ও তাহার পিতামাতা সন্তানের অবস্থা সম্যক বুঝিয়া কখনই তাহাকে কঠোর শাসনে রাখিতেন না, বরং ক্রমান্বয় আদর দিয়াই আসিতেন। পাছে অভাগীর মনঃকষ্ট হয়, এজন্য তাঁহারা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য কালোমুখে কথা কহিতেন না, বা এমন কাজ করিতে দিতেন না, যাহাতে তাহার মনে দুঃখ হইতে পারে।

ইন্দুমতী শুনিয়াছেন, স্বামী বিয়োগের পর সুবর্ণ পেড়ে-সাড়ী পরিতে চাহিত না, কিন্তু সুবর্ণের মাতা জোর করিয়া সুবর্ণকে পেড়ে-সাড়ী পরাইতেন, কারণ তাহা না হইলে মাতা বিধবা-কন্যার সম্মুখে নিজে উহা পরিবেন কি করিয়া? সুবর্ণ শুধু মাছটি খাইত না, কিন্তু পিতার দৌরাত্ম্যতে ফুলকপি, শালগম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈধব্য-নিয়ম-বিরুদ্ধ সমস্তই না খাইয়া পারিত না।

সুবর্ণের পিতা একটু সৌখীন ছিলেন, বেশ বাবুগিরি করিতেন। তিনি তাই মেয়ের জন্য আলাদা সাবান, তুষার, সুগন্ধি তেল, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া মেয়েকে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতেন।

সুবর্ণ এযাবৎ কোনও রাত্রিতে লুচি বা পরোটা, আলুর তরকারী অথবা মিষ্ট প্রভৃতি ভিন্ন খায় নাই; কোনও উপবাস, যথা, একাদশী, শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ব্ব পালন করে নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের যতরূপ বন্ধন আছে, তাহা তাহার কাছে অতি শিথিল ছিল; তাহাতে তাহার পিতা-মাতা বরং উৎসাহই দিতেন।

সুবর্ণের তাই উন্নত বক্ষ, রসাল দেহ, চঞ্চল নয়ন, সিক্ত অধর। কিন্তু এইরূপ সঙ্গীন-অবস্থায়ও সুবর্ণের মাতা সুবর্ণকে ছোট্ট অভাগী মেয়ে বলিয়া যে লক্ষ্মণ ভাইয়ের সঙ্গে এক কক্ষে শুইতে দিতেন—অবশ্য তিনি উভয়ের পৃথক শয্যার বন্দোবস্ত করিতেন, তাহার কারণ দুইটি ছিল। প্রথমতঃ, সুবর্ণের মামা শিক্ষাপ্রাপ্ত, আই, এ, পাশ। দ্বিতীয়তঃ, উহা না হইলে সুবর্ণের মাতার সুবর্ণের পিতার

প্রতি প্রৌঢ়-জীবনের নিষ্ঠুরতা করা হয়। মেয়ের প্রতি স্নেহও যেরূপ সঙ্গত, পতির প্রতি নির্ম্মমতা ও সেরূপ অসঙ্গত।

যাক। এইরূপে সুবর্ণের জীবনের নাট্য-লীলার পটপরিবর্ত্তন হইতেছিল। ইন্দুমতী তাই সুবর্ণের রমেনের সহিত ভিড়িয়া যাওয়াকে সমর্থন করিতেন। তিনি উহাতে সম্প্রতি এই উপকার পাইয়াছিলেন—ময়নার প্রতি উহা যেন হইয়াছিল গণ্ডারের চামড়ার ঢাল।

রমেন সুবর্ণকে লইয়াই মত্ত থাকিত। এ-দিকে সাধিকা ভয় দেখাইয়া, যথা, শীঘ্রই তাহারা এ বাসা ছাড়িয়া দিবে, রমেনের নিকট হইতে এ-সংসারের যাবতীয় খরচ আদায় করিত। রমেনও বিনা-আপত্তিতে বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত ব্যয় সহাস্য-মূর্ত্তিতে দিয়া দিত।

ইন্দুমতী রমেনের চরিত্রে একটি জিনিস দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে রমেনের সন্তোষ ও নিরুদ্বিগ্নতা। রমেন ছিল সমস্ত অবস্থায় খুসী। টাকা পয়সা তাহাকে রোজগার করিতে হইত, তাই সে করিত, কিন্তু টাকা-পয়সার যে তাহার খুবই দরকার ছিল, ইহা তাহার কখনই যেন মনে থাকিত না। আজ সে কেরাণী-গিরির শতেক টাকা আনিল, কাল পরশুর মধ্যে তাহার যেন হাত খালি। টাকা হাতে পাইয়াই সে ধুম দাম করিয়া ইহা কিনিত, তাহা কিনিত, তারপর আবার মাসকাবারের পানে সতৃষ্ণনয়নে

চাহিয়া থাকিত। কিন্তু এই তাকাইয়া থাকার মধ্যে রিক্ততা লইয়া তাহার বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তা আসিত না। যদি সে অর্থের একটু অধিক আবশ্যকতা-ই মনে করিত, তবে সে অফিসের সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে অথবা বন্ধুবান্ধবের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিত। শূন্যতা তাহার ছিল স্বোপার্জ্জিত অর্থের, ঋণ করিয়া চালাইতে হইলেও টাকা সে কাছে রাখিত। তাহার ধারণা ছিল, যদি কেহ কিছু তাহার কাছে চাহিয়া না পায়, তবে সে বড়ই ছোট হইয়া পড়িবে, তাহার মান বুঝি ক্ষইয়া যাইবে।

ইন্দুমতী রমেনকে নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে একটি বড়ই আশ্চর্য্য, অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা শুধু এই বলা-- 'রমেন! তোমার ত্রিশটি টাকা তো খরচ করে ফেললাম, কখন তোমার দরকার?

ইন্দুমতী যদিও প্রত্যক্ষ জানিতেন ও বুঝিতেন, ঐ ত্রিশ টাকা পুনরায় একত্র করিয়া দেওয়া হয় তো তাঁহার জীবনে ঘটিবে না, তথাপি তিনি রমেনের কাছে যেন অপ্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু রমেন কাকীমার ঐ অপ্রস্তুততায় সত্যই ঘা খাইত, তাই ঐ বিষয় কথা উঠিলেই সে সরিয়া পড়িত। ইহাতে ইন্দুমতী চমৎকৃতা হইতেন।

রমেন বড়ই পরিবর্ত্তনশীল ছিল। তাহার চরিত্র কিরূপ ধরণের খারাপ ছিল, তাহা ইন্দুমতী বুঝিতে পারিতেন না। রমেন নারীর নামে লাফাইয়া উঠিত বটে, কিন্তু কোন মেয়েটি যে তাহার

চোখে চিরস্থায়ী সুন্দর তাহা বুঝিয়া পাওয়া যাইত না, কারণ এই সুবর্ণ, যাহাকে লইয়া সে ইদানীং যেন মাতিয়া ছিল, সে-সুবর্ণের কথাও তাহার সমস্ত সময় মনে থাকিত না।

যদি কোন স্নানের যোগ গঙ্গার ঘাটে পড়িয়া যাইত, রমেনের তখনকার ব্যবসায় ইহা হইত, যে গঙ্গাতীরে যে কয়েকটি ঘাট ছিল, সেখানে গিয়া তাহার চৌ-পর-দিন মহলা দেওয়া, আর তের চৌদ্দ বছরের মেয়েদের মুখের পানে হা করিয়া তাকাইয়া থাকা। অন্য স্নানযাত্রীদের গায়ে গায়ে রমেনের ধাক্কা লাগিলে সে চটিয়া লাল হইত।

রমেন ঐ দিনে যে কত জায়গায় হোঁচট খাইত ও কত লোকের গালাগালি সহ্য করিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দুমতী উহা দেখিতেন, আর বিস্মিতা হইতেন।

সে-দিন হোলী-উৎসব ছিল। সুবর্ণ বহু পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, রমেন বাবুর সঙ্গে এ-বারে দোল খেলিবে। সে তাই তাহার বাবাকে দিয়া সের-আড়াই আবীর, আড়াই পোয়া কুঙ্কুমে-আভ্রে-মিশানো, দুই আনার খুনখারাপি রং, কিছু বাঁদুরে রংও বটে, আর একটা পেতলের পিচকারি কিনাইয়া আনিয়াছে। রমেন ইহা জানিত না। সে গত রাত্রিতে একটা বায়োস্কোপে গিয়া 'র‍্যামন-নোভারো-ছং' প্লেটি দেখিয়া মত্ত হইয়া গিয়া আর নাকি বাসায় ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছিল না। সে মনে করিয়াছিল,

বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে প্রেম করিয়া নাকি পিপাসা মেটে না। সে তাই স্থির করিয়াছিল, পালাটি ভাঙ্গিলে ঐ ষ্টেজে ঢুকিয়া ষ্টেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়া লইবে—কলিকাতায় ঐ-রূপ ফিলম তোলা হয় কিনা, কিন্তু রমেন বায়োস্কোপান্তে তাহার জানিবার বিষয়টির বিশেষ কোনও সন্ধান তথায় না পাইয়া অনেক রাত্রিতে বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আজ ঘুম হইতে উঠিতে তাহার বিলম্ব হইতেছিল।

সুবর্ণ তাই রমেন বাবুর ঘরে ঢুকিয়া কতগুলি রং আনিয়া শয্যায় নিদ্রিত রমেনবাবুর সমস্ত মুখখানি ভাল করিয়া বিচিত্র করিল। রমেন উহা টের না পাইয়া ঘুমের ঘোরে 'রোমন-নোভারো আইডিয়েল-লভার' বলিয়া একেবারে সুবর্ণকে জড়াইয়া ধরিল। সুবর্ণ তদবস্থায় থাকিয়া হাতে করিয়া আরও কতগুলি রংয়ে রমেনকে ছোপাইয়া দিয়া 'হোলী হোলী' করিতে লাগিল। রমেন তখনও নিদ্রিত।

তখন সন্তঃ-প্রত্যূষ। দিবালোক তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। ছিন্ন-তিমির সেই তেতলার ছাদে লুব্ধ-মিহিরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছিল। অন্ধকার প্রকৃতি, আলোক পুরুষ। পুরুষের জয় হইল, প্রকৃতি হারিয়া গেল। অচিরে আলোক অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া ঢাকিয়া রহিল। রমেন ও সুবর্ণকে রাঙিয়া দিল।

ইতাবসরে সাধিকা চিরস্বভাবনুযায়ী ছাদে আসিয়া দেখিল—আজ হোলী এবং হোলীর জীবন্ত-প্রতীক এই দুই বাঞ্ছাকল্পতরু। রমেন এত মাতামাতিতে জাগিয়া পড়িয়াছে। কোমলে-কঠিনেই যুক্ত হয়। তাহার কেন না বোধন হইবে ?

সাধিকা এ-রূপ শুভদিনে এই যুগ্ম-মেলন দেখিল। ইহাই দোল-লীলার মেরুদণ্ড কি ? লীলাময়ের লীলাস্থলী। সেই যমুনা পুলিনে রাধাশ্যামের অতুল-প্রেম-লীলা। শ্যাম-চিক্কণ-ঘন-মধুর মোহন-রূপের অনুরাগ, আর ভুবন-মনো-মোহিনীর উন্মাদনা। হোলী, দোল-উৎসব। কতদিন আজ অতীত হইয়াছে। সেই স্মৃতি, সেই প্রেমের স্মৃতি, সেই অনাবিলতার স্মৃতি আজ দিগন্তে মুখরিত। হে আমার দেব! হে আমার প্রেমিক! হে আমার প্রভু! তুমি এ জগতে যে শিক্ষা, যে নীতি, যে আদর্শ দেখাইয়াছ, তাহারই কি এই অপভ্রংশ ? শ্রীরাধার প্রেম—যাহা অতি সত্য, অতি মধুর, অতি নির্ম্মল, তাহারই তো এই অপব্যবহার! লীলাময়! এই ভ্রংশতার আবিলতা পরিত্যাগ করিলে ইহা কত অস্তিত্বময়! অবাস্তব না দেখিয়া আমি যেন চিরবাস্তব দেখিতে পাই।

সাধিকা যেন আর ছাদে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার মন বড়ই খারাপ হইল।

সে মনে করিল, আর না। অনেক দেখিয়াছি, ইহা আর আকণ্ঠ পান করিব না। সে একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

বলিতে কি, তাহার গত জীবনের দিনগুলি স্বতঃই মনে জাগিল। এই সেই কক্ষ, এই সেই সাজ-সরঞ্জাম, আর ঐ সেই দ্বিপ্রহর। বিমান-দা তাহাকে এখানেই, সেই দিনই এইরূপই প্ররোচিত করিতে প্রলুব্ধ করিতেছিল। আমিও পতিত হইয়াছি! আমি কেন বিমান-দার লুব্ধ-দৃষ্টি-বহ্নিতে অন্ধ পতঙ্গের মত জড়াইয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? সেই সুদূর বাল্যকাল হইতেই বোধহয় বিমান-দা আমার প্রতি শ্যেন-দর্শনে চাহিয়াছিলেন, নতুবা তাহার এত আদর, এত পরিশ্রম, এত অর্থ-দণ্ড হইয়াছিল কেন? হে ভগবান! আমি আজ দীনা, আমি আজ বিগত-জীবনের সমস্ত কলুষরাশির স্বীকারোক্তি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি কি সত্যই বিমান-দাদাতে লুব্ধা হইয়াছিলাম? হাঁ, লোভ হইয়াছিল তাহার মধুর প্রতিকৃতিতে, কিন্তু সে লোভ কখনই ইন্দ্রিয়-জাত নহে। দর্শন নয়নের ধর্ম্মই পালন করিয়াছিল। কুসুম সুন্দর, তাহার দিকে আমরা তাকাইয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা কুসুমের প্রতি মত্ত হই?

বস্তুতঃ বিমান-দা আমাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তো আমার মনে মোহ আনয়ন করে নাই। উঃ! আবার মনে হয়—এই সেই প্রকোষ্ঠ, এই সেই পাপ কক্ষ, এই সেই পতন-নিকেতন। না, আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিব না। আমার দেহ ওখানে যখন অবমানিত হইতে যাইতেছিল, তখন আমার স্বামী

আসিয়াছিলেন। তাঁহার করালমূর্ত্তি যেন দণ্ডধারী সেই স্মরণীয় মুহূর্ত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উঃ! আর গতি নাই। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। দেহ মৃৎ-পাত্র স্বরূপ। দেহ উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, আর মৃৎ-দেহ ঘর্ষনে মার্জ্জনে পূত হইবে না।

সাধিকা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া বহুচিন্তা করিয়াছিল, শেষে আর সে ভাবিতে না পারিয়া মায়ের কাছে গেল। মাতার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া সাধিকা যথারীতি মাতাকে শায়িতাই দেখিল। সে আর তখন তাঁহাকে ডাকিল না, বা ঘরের ভিতর বিশেষ শব্দ করিল না। মাতা কিন্তু তাহাতেও টের পাইলেন, যে কন্যা ঘরে আসিয়াছে।

ইন্দুমতী তখন ময়না বলিয়া ডাক দিয়া বলিলেন—বোস, এখানে বোস।

ময়না মায়ের গায়ে গা মিশাইয়া বসিল। মাতা তখন উঠিলেন। তিনি সহসা বালিশের তলায় হাত গুঁজিয়া দিয়া সেই খামের চিঠিটা টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন—ময়না! চিঠিখানা পড় তো। ময়না বলিল—মা! চিঠির ভিতর এমন কি নূতনত্ব আছে, যে তুমি ঐ চিঠিখানা লক্ষবার পড়তে ও বিরত থাকবে না? ওতে তো আছে শুধু অপবাদ, ভীষণ ইঙ্গিত। মা! আমি ব্যভিচারিণী হয়েচি, তুমিই আমাকে তাতে প্রবৃত্ত করাচ্চো—তাইই শ্বাশুড়ী বলেচেন। মা! এত অপমান আমার-মা আমায় চিঠিতে করলেন?

আমি তাঁর পুত্রবধূ। মা! শ্বাশুড়ী কি আমার চরিত্রের বিষয় এমন কিছু প্রমাণ পেয়েচেন, যাতে আমাকে কুলটা ভাবতে সাহসী হলেন?

সাধিকার কণ্ঠে তখন দীপ্ত তেজ উদ্ভাসিত হইল। যেন তাহা সেই কবির ভাষায়, ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নি।

ইন্দুমতী এতকাল তাহাকে ছোট্ট অবুঝ মেয়ে মনে করিয়াছেন এবং তাহাকে তাঁহারই শিশু ময়না দুর্ব্বলা বালিকা ভাবিয়াছেন, কিন্তু মেয়ের অন্তরে যে এত আত্মসম্মান-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা তিনি কখনও মনে করেন নাই। ইন্দুমতী, যিনি দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষনে দিন দিন দুর্ব্বল-চিত্তা হইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার চোখের সামনেও যেন তন্মুহূর্ত্তে সাধিকার কঠিন দৃঢ়তা প্রতিভাত হইল। তিনি নিজেও তখন রোষ-দীপ্তা না হইয়া পারিলেন না।

তিনি বলিলেন, ময়না! দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার যে সাংসারিক ধর্ম্ম। এতে ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, দুঃখিত হয়ে যে কোনও লাভ নাই, বরং দৈন্যের বোঝা আরও টেনে আনা হবে। ময়না! এখন কি উপায়?

উপায়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে সাধিকা আরও দৃঢ়তর হইয়া বলিল—

মা! আমি উপায় স্থির করেচি। মা! আমি 'দেবী চৌধুরাণী' হবো। বিমান-দার কাছে সেই ঔপন্যাসিকের প্রফুল্লর গল্প শুনেচি। আমি তাই কর্ব্ব।

ইন্দুমতী উহা কিছুই বুঝিলেন না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সাধিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুবর্ণ গুপ করিয়া রঙ-বেরঙে সাজিয়া সাধিকার কথায় জবাব দিল— হাঁ, ভাই! তুমি শ্বশুর বাড়ীতে স্থান না পেয়ে যখন এসে ডাকাতের দলে যোগ দেবে, বা বজরায় অভিযান কর্ত্তে যাবে, তখন আমি তোমার সেনানী হবো। আর শেষে ঢাক-ঢোলে যখন তোমায় শ্বশুর-বাড়ী থেকে বরণ করে নিতে আসবে, তখন আমি তোমার সই বা দাসী, একটা কিছু হবো।

ইন্দুমতী চুপ করিয়া গেলেন। সুবর্ণের এ-রূপ ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি যেন ঘৃণায় মগ্না হইলেন। তিনি আর তাহার দিকে বিশেষ তাকাইলেন না। সুবর্ণ বলিল— কাকীমা! আজ হোলী! কাকীমা! আমি তোমার পায়ে একটু আবীর বুলিয়ে দিয়ে যাচ্চি। কাকীমা ইহাতে বিশেষ হাঁ, না, করিলেন না, কারণ কোনও কথা বলিলেই তো সুবর্ণ ঘর ছাড়িয়া যাইবে না। ইন্দুমতী তাই সুবর্ণের কথিতানুযায়ী পায়ে আবীর পরিলেন।

সুবর্ণ ইন্দুমতীকে আবীর পরানো শেষ করিয়া যখন সাধিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'ছি ময়না! আজকার দিনে কি গুমড়ে বসে থাকতে হয়? এসো, হোলী খেলি', তখন চুপ করিয়া রমেন ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল। সে রাস্তা হইতে বাঁদর সাজিয়া মস্ত বড় এক হাঁড়ি খাবার কিনিয়া লইয়া আসিয়াছে।

রমেন বলিল—সুবর্ণ! শুধু আবার মাথাতে এসেচো? দাও, কাকীমাকে নমস্কার দাও, আর এই শুদ্ধ-কাপড়ে-তৈরী রসগোল্লা গুলি কাকীমাকে দাও। ময়না! এস, সবাই মিলে খাবারগুলির কিনারা করি।

সাধিকা তখন ঐ কক্ষ ত্যাগ করিল এবং বলিয়া গেল— থালা আনচি।

রান্নাঘরে থালা আনিতে গিয়া সাধিকা দেখিল, মাত্র দুইখানা থালা-প্লেট ধোয়া আছে। সে আর দুইখানা সকড়ি বৃন্দাবনী লইয়া কল-তলা মাজিতে গেল। কিন্তু তাহার বাসন মাজা কি করিয়া চলিবে? সে কাঁদিয়াই অস্থির।

তাহার মনে হইয়াছে, তাহার স্বামীর একমাত্র প্রিয় পর্ব্ব দোল-পূর্ণিমা, ও তাহার উৎসব।' এই তো সেই চাঁচর, বুড়োবুড়ী পোড়ানো। আজ তাহার স্বামী কোথায়! সাধিকা স্বামী, স্বামী বলিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। তাহার বিবাহের রাত্রির স্বামীর অদ্ভুত চীৎকারের কথা মনে পড়িল। স্বামীর পার্শ্বের সেই প্রাণের বন্ধু নদেঠাকুরপো। বন্ধুর কথায়ই তো তিনি বাকরুদ্ধ হইয়া চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক নিস্তব্ধ ছিলেন, শেষে সেই গৃহ-দাহের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর চীৎকার না করিয়া পারিয়াছিলেন না।

সাধিকা মনে করিল, সে অতি শীঘ্র এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রাপুরে যাইবে এবং তাহার স্বামীর বন্ধু নদেরচাঁদঠাকুরপোকে

একবার দেখিবে, এবং সম্ভব হইলে তাহাকে অনুরোধ করিবে, স্বামীকে তিনি খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারেন কিনা। চুম্বক লোহ আকর্ষন করে। বন্ধুর ভালবাসা বন্ধুকে টানিয়া আনিবে। অন্যে তাহা পারিবে কেন?

সাধিকা থালা আনিতে দেরি করিতেছে দেখিয়া সুবর্ণ ঐ ঘর হইতেই চীৎকার করিল—ময়না! ভাই! থালা কি তোমায় গিলে খেল?

ইন্দুমতী সুবর্ণের কোনরূপ অমায়িকতা আজকাল পছন্দ করিতেন না। ক্রমেই যেন সে তাঁহার চক্ষুশূল হইতেছিল। ইন্দুমতী তাই বলিলেন—সুবর্ণ! তুমি কি স্নান না করেই এ-সব খাবে? সুবর্ণ বলিল—কাকীমা! আজ যে হোলী। আমি যে পরম বৈষ্ণব।

ইন্দুমতী আর কোনও কথা বলিলেন না। রমেন বলিল—কাকীমা! সুবর্ণ বেশ 'আপ-টু-ডেট'। আমার তাই ওকে বেশ ভাল লাগে। বাঃ! সুবর্ণ! বেশ দেখাচ্চে তো! কাকীমা চোখ বুজিলেন এবং যেন কানে আঙ্গুল দিলেন। ক্রমে দুইটি দিন কাটিল।

সাধিকা স্থির করিয়াছে, সে তাহার মাতাকে লইয়া সকাল-নয়টার ট্রেনে আজ যাত্রাপুর রওনা হইবে। প্রাতঃকাল হইতে রমেন বায়না ধরিয়াছে, সে উহাদের সঙ্গে যাইবে। সাধিকা তাহাতে

কোনও মতে রাজী হইল না। ইন্দুমতীও কন্যার কথায় মত দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে অন্য কেহ না থাকিলে যে তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর বাহির হইতে চান না। ময়না বলিল, না, না, তা হবে না। কাউকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না। তাতে যা-ই হয়, হউক। মা! যদি কাউকে সঙ্গে নিই, তবে আমরা দোষী হবো, শ্বশুর বাড়ীর লোক বলবে, যার তার সঙ্গে এরূপ করে বেড়ায়, আর যদি কাউকে সঙ্গে না নিই, তবেও তারা বলবে, ছোট লোকের জাত, এদের সঙ্গে আবার কি সঙ্গীর দরকার হয়? দুই দিকেই আমাদের মুস্কিল। সে-ক্ষেত্রে কোন লোক সঙ্গে নিয়ে কারও রক্ষিতা হবো না। আমরা সবার রক্ষিতা সাজবো। এ-বিশ্বই আমাদের রক্ষক। মা! যার কেউ নাই, তার যে সব আছে, তা কি তুমি জানো না?

রমেনকে সঙ্গে লইয়া ইহারা যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় সুবর্ণ বলিল—রমেন বাবু! আমরা এদের ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তাই ভাল। এ-বাড়ীটা তো রক্ষা করা চাই। সব জিনিস পত্র ফেলে কি করে সকলে যাওয়া যায়? যদি দরজা ভেঙ্গে চোরে সব নিয়ে যায়।

রমেন বলিল—তা কি হয় সুবর্ণ? এরা যে আমার পাহারায় আছে। এরা যে বিমানের আশ্রিত। বিমান নাই, এখন যে এরা আমার কর্ত্তৃত্বাধীন। শত হলেও বিমানের সঙ্গে যে অনেক

দিন একত্র পড়েচি। বিমান তো ওখানে থেকে ও আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি ধর্ত্তে পারে। তা হয় না সুবর্ণ! তুমি এ কয়েকটা দিন আর কাউকে নিয়ে এ-বাসার প্রহরী থেকো। আমি এদের সঙ্গে যাবোই।

রমেন বলিল - কাকীমা! ভয় নেই, ময়নার কোনও অনিষ্ট আমায় নিলে হবে না। যা হবে, তা এমনিই হবে। আর ময়না তো আমার কাকীমার মেয়ে, আম'র বোন, অপর তো কেউ নয়।

নয়

চারু নদেরচাঁদের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া যেরূপ শান্তি পাইয়াছিল, এরূপ শান্তি বোধ হয় তাহার জীবনে সে কোনও দিনই পায় নাই। কার্ত্তিকের বন্ধু নদেরচাঁদ, ওলের বন্ধু তেঁতুল। সেই নদেরচাঁদ পত্নী-ভাগ্য যে এরূপ চমৎকার, তাহা চিন্তা করিয়া চারু শুধু ভগবানের বিচার শক্তির তাৎপর্য্যের তারিফ করিল। এমন সরল উৎক্ষিপ্তকে সংসারে বাঁধিয়া স্থির করিয়া রাখিতে হইলে যে এরূপ ধীরা, বুদ্ধিমতী দেবীর আবশ্যক, ইহা তিনি ভিন্ন কে বুঝেন? চারু তাই নদেরচাঁদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া এই অত্যন্ত ভালবাসার জনকে ফেলিয়া কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না।

এদিকে কমলা চারু-দিদিকে যেন শিরিসের মত জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে শুধু বলে—চারু-দি! বলুন তো আপনি আমার পূর্ব্ব-জন্মে কে ছিলেন? আমার আপনাকে এত মধুর লাগে কেন? ইচ্ছা করে, 'চারু-দিদি' 'চারু-দিদি' করে দিনরাত আপনার আদর-যত্ন করি, আপনার কথা শুনি, আপনার কোলের মধ্যে শুয়ে বুকে মুখ গুঁজে থাকি। চারু-দি আমি কিছু চাই না; আপনি শুধু বলেন 'কমলা, তুই আমার আপনার-ভাজ।' চারু-দি! সত্যি আপনি মন্তর জানেন, নইলে যে এমন উগ্রচণ্ডী, তাকে আপনি কি করে হাতের মুঠোর মধ্যে করে রেখেচেন? ওতো চারু-দি, চারু-দি করে অস্থির। চারু-দি! সাপুড়ে না হলে কি সাপ ধর্ত্তে পারে?

চারু-দি কমলার কথায় মনে মনে শুধু বলিল—কমলা যাহা আমাকে বলিয়াছে, তাহা শুধু তাহার নিজের পক্ষেই প্রযোজ্য। নইলে স্বামীকে বশে রাখতে বধূ ভিন্ন সংসারে কে পারে? এতে সীতা-সাবিত্রী ও সাজতে হয়, কমল-কিরণময়ী ও হতে হয়। কমলাতে চারু-দি যেন সর্ব্ব-সমন্বয় দেখিয়াছিল। সেই ফুটফুটে চেহারাটুকু, সদা-হাসি মুখখানি, মধুর কথাগুলি, সমস্তই যেন কমলাকে মা-কমলা করিয়াছিল। নদেরচাঁদ কিন্তু কোনও দিন চারু-দিকে তাহার বৌয়ের কথা বলে নাই। চারু-দি সে-দিন নদেরচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উহা জানিয়াছিল।

কমলাকে দেখা অবধি চারুর মনে একটা মস্ত বড় আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল—ভগবান অপরিমেয় দয়া প্রদর্শন করিয়া কার্ত্তিকের প্রতিও এরূপ সদয় হইবেন, কার্ত্তিকের বধূও কমলার মত হইবে, যদিও কার্ত্তিক নদেরচাঁদের উপরে এক কাঠি বেশী ছিল। কিন্তু চারু সেই রাত্রির কথা মনে করিয়া নিতান্ত ব্যথা পাইল। তাহার চির সাধ—কার্ত্তিকের বধূকে দেখিবে, যেন মুহূর্ত্তে ধূলির সাথে মিশিয়া গেল। সাধিকার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, জীবনে হয় তো সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু সে-দিনকার ব্যাপারে সে-সম্ভাবনা চিরজীবনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। চারু সেই বড়মামা-প্রেরিত চিঠির কথা যেন ভাবিতেই পারিত না। ছি! ছি! এরূপ কলঙ্কারোপ কোনও বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষে করিতে পারে—এ-দিকে জানিলাম না শুনিলাম না তাহার ইতিবৃত্তান্ত? সন্দেহের উপরও তো এ-কার্য্য করা হয় নাই। একটা ব্যাপার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার দিকনির্ণয় করিতে না পারিয়া হয় তো সংশয় হইতে পারে, কিন্তু এ যে কিছুই না। শুধু আক্রোশ।

চারু এ-ব্যাপার লইয়া নিজে নিজে বহু চিন্তা করিয়াছে। শেষে উহার নির্দ্ধারণ করিতে অপারগ হইয়া নদেরচাঁদের নিকট আমূল শুনিতে চেষ্টা করিয়াছে, তারপর কথাচ্ছলে কমলার কাছেও উহা বলিয়াছে, কিন্তু কিছুই যে উহার কিনারা করিতে পারে নাই। তাহার শুধু ইহা মনে হইয়াছে—কেন নদেরচাঁদকে সে উত্তেজিত

করিল ? কিন্তু নদেরচাঁদই বা ক্ষেপিয়া কি করিবে ? বড়মামা যে নদেরচাঁদের ও বটে। নদেরচাঁদ গোঁয়ার-গোবিন্দ হইলেও চারু-দি যে তাহার বিবেক। সে বিবেকের বিরুদ্ধে যে যাইতে পারে না।

চারুর মন তাই পুড়িয়া খাঁক হইয়া যাইতে লাগিল। সে নিরুপায় হইয়া শুধু নদেরচাঁদকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল— যেন সে অন্ধকারে দা. কুড়ুল, সড়কি বড়মামাকে ছুঁড়িয়া না মারে। অবশ্য নদেরচাঁদ চারু-দির পা ছুঁইয়া স্বাকার করিয়াছে, যে সে বড়মামাকে কিছু বলিবে না, কিন্তু গ্রামের অন্য কেউ যদি এ-বিষয় লইয়া কোঁদল করে, তবে নদেরচাঁদ তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইবে, অর্থাৎ রাত্রিকালে চৌ-মাথা পথের উপরের গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকিবে, এবং সেই কোঁদল-কারী হাট-বারে সেই পথে যাইতে কালে, তাহার মাথায় সেই গাছের উপর হইতে বড় বড় থান-ইট,. অথবা নুড়ি-পাথর ছুঁড়িয়া মারিবে, অথবা উঁচু হইতে লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িয়া সেই লোকের ঘাড় মটকাইবে। চারু-দির ইহাতেও ভয় হইল।

কয়েকদিন পরে নদেরচাঁদ তাহার অভ্যাস-মত রাত্রিকালে ষ্টীমার-ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছে। সঙ্গে একটি টীনের লণ্ঠন। তাহার মধ্যে একটি ছোট কেরোসিনের ডিবা টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। পথে আসিবার কালে নদেরচাঁদ বার বার লণ্ঠনের কাচ চারিখানি পরখ করিয়া লইয়াছিল, যে উহার মধ্যের যে দুইখানি

কাচ ফাটিয়া গিয়াছে, তাহা চলিতে গেলে পড়িয়া যাইবে কি না, আর এদিকে কেরোসিনের কালী তাহার হাতময় হইয়া যাইতেছিল। ইত্যবসরে টোনা-ষ্টেশনের একটু দূর হইতেই ষ্টীমারে সিঁটি দিল, যাহা তাহার কাছে আবাল্য চিররম্য লাগিয়া আসিতেছে।

তাহার মনে পড়িল, কার্ত্তিকের সঙ্গে সে কত কাল একত্র হইয়া অন্ধকারে শুপারি, নারিকেল, আম, জাম, এঁটেলি, খেঁজুর বৃক্ষ সারির মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ষ্টীমার ধরিয়াছে এবং ষ্টীমারে আগত ভদ্র, ইতর জাতির কত মোট-মাটালি কাঁধে ফেলিয়া ষ্টীমারের ডেক হইতে নদীর তীরের অসমতল চড়ার উপর পাতানো একখানি তক্তার সিঁড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণে কুলির মত মাল নামাইয়া আনিয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে ঐ মালপত্র আবার টোনা-ষ্টেশন হইতে দূরে গ্রামের ভিতর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহাতে উপকৃতেরা কার্ত্তিক-নদেরচাঁদকে কত ভাল বলিয়াছে, যে এরূপ পরোপকারী দেশের যুবকই আজকালকার মহাভারত-প্রদেশের প্রাণ।

কিন্তু আজ কার্ত্তিক তাহার সঙ্গে নাই। তাই নদেরচাঁদ ভাঙ্গা-মনেই অভ্যস্ত কার্য্য করে। আর প্রতিদিনের ষ্টীমারেই সে ভাল করিয়া খুঁজিয়া-পাঁতিয়া দেখে, কার্ত্তিক আসিয়াছে কি না। তাহার অদৃষ্টে আর দৌড়াইয়া গিয়া চারু-দিকে নূতন খবর বলিয়া বাহাদুরী বা আদর পাওয়া ঘটে না।

চারু-দি অবশ্য রোজই অভ্যাস-মত জিজ্ঞাসা করিত—নদেরচাঁদ। আজ ষ্টীমারে কে কে এলো? নদেরচাঁদ বলে—এ, সে, কত লোক।

ষ্টীমার আসিয়া ষ্টেশনে অনেকক্ষণ লাগিয়াছে। সে-দিন ষ্টীমারে বেজায় ভিড় ছিল। বোধ হয় কোনও ছুটি উপলক্ষে বাবুরা দুই এক দিনের জন্য দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। নদেরচাঁদ অন্ধকারে অনেকের হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছে এবং জোরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'সারেং! সাবধান, সাবধান, সিঁড়ি যেন পড়ে না, সিঁড়ি যেন পড়ে না! ভাল করে 'ব্যোম্বু' ধর খালাসি! প্যাসেঞ্জার নামছে।

ইত্যবসরে নদেরচাঁদ শুনিতে পাইল—মচ করিয়া সেই তক্তার সিঁড়িখানা ভাঙ্গিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়াছে, আর এক-সিঁড়ি-লোক জলে হাবুডুবু খাইতেছে। নদেরচাঁদ লাফাইয়া গিয়া জলে পড়িয়া দেখিল, ঘাটে জল কম, এক-গলা হইবে। সে গগনভেদী চীৎকার করিয়া বলিল—'ভয় নাই, ভয় নাই, ভাঙন না, ভাঙন না, চড়া।'

ষ্টেশনে ও ষ্টীমারে মহা কলরোল পড়িয়া গেল। যাহদের যেরূপ আলো ছিল—কাহারও দেশী-লণ্ঠন, কাহারও হেরিকেন, সমস্ত তাঁহারা বাহির করিল।

নদেরচাঁদ দৌড়াইয়া জল হইতে উঠিয়া, নিকটবর্ত্তী একটা চালা-ঘরের দোকানে ঢুকিয়া, গরুকে খড়-জল দিবার একটা বড়

তাগারীতে এক বস্তা তুষ ভরিয়া, ঐ দোকানের এক টীন কেরোসিন তেল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া, ষ্টেশনের উঁচু মাটির ঢিঁবির উপর আনিয়া রাখিল। দোকানী অবশ্য ক্যাট ক্যাট করিতে লাগিল, কেন অতগুলি তুষ ও কেরোসিন তেল নদেরচাঁদ লইয়াছে ? নদের-চাঁদ তাহাকে ভয়ানক চোটের সহিত তাড়া দিয়া বলিল—এতগুলি লোক ডুবে মরচে, আর তোমার ও দুটো তুষ, একটু কেরোসিন গেল, তাই তোমার ভারী বেজেছে ? নিও আমার বাড়ী থেকে ওর চার-ডবল তুষ ও এই তেলের দাম।

নদেরচাঁদ দৌড়াইয়া গিয়া, বিড়ি ধরাইবার দেশলাই নিজের ট্যাঁকের টীনের কৌটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া, ঐ পাত্রে আগুন ধরাইয়া দিয়া, উহা একবার উস্কাইয়া দিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণ অনলালোক দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ষ্টীমারের 'সারেং'—আচ্ছা বাবু, আচ্ছা বাবু করিতে লাগিল। প্যাসেঞ্জারগণ ঐ আলোকে নিজেদের লোকজন, জিনিষপত্র কুড়াইতে লাগিল।

রমেন জলে পড়িয়া আর উঠিতে পারে নাই। তাহাকে না দেখিয়া সাধিকা বলিল—মা! রমেন-দা ?

সাধিকা মাতাকে লইয়া আগেই আসিতেছিল, তাই তাহারা দুইজন ঘাটের গোড়ার সিঁড়ি হইতে একটু লাফ দিয়া তীরে পড়িতে পারিয়াছিলেন, যদিও তাহাদের সমস্ত কাপড়চোপড়ে জল-কাদা

ছিঁটিয়া গিয়াছিল। সাধিকা তাহা সংযত করিয়া পুনরায় বলিল—মা! রমেন-দা?

নদেরচাঁদ অদূর হইতে এই মহিলাটির অস্ফুট-কণ্ঠ—'মা! রমেন-দা?' শুনিয়াছিল। সে কাদামাখা-ভিজা-কাপড়ে মহিলাটির প্রতি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'বৌদি! কি বলচেন?'

মহিলা জবাব দিল—আমাদের সঙ্গের আমার দাদাকে দেখচি না তো।

নদেরচাঁদ হাফাইতে হাফাইতে জিজ্ঞাসা করিল—বৌদি! তাঁর নাম কি?

মহিলা উত্তর করিল—রমেন বাবু।

নদেরচাঁদ তখন অতি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'রমেন-বাবু! রমেনবাবু! আপনি ষ্টীমারে না জলে? সাড়া দিন, আপনার সঙ্গের ভগিনী ডাঙ্গায় উঠেচেন, সাড়া দিন। রমেনবাবু, যে সিঁড়ি ভাঙ্গায় সুটকেস লইয়া একেবারে ষ্টীমারের কোলে গিয়া পড়িয়াছিল, হাঁক দিল—ভয় নাই, ব্যস্ত হয়ো না, এই যে আমি রমেন।

নদেরচাঁদ তখন পুনরায় ঝাঁপাইয়া গিয়া রমেনবাবুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং দেখিল—'ভদ্রলোক গলা-জলে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতেছেন। তাঁহার গায়ের পরণ-পরিচ্ছদাদিতে এবং

সুটকেসটির জন্য তিনি এত ভারী বোধ করিতেছেন, যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। রমেনের বাড়ী ছিল বীরভূমে, নদী আসিয়া দেখিয়াছে গঙ্গা, তাহার উপর তো হাওড়ার পুলই আছে, বাসে মোটরে গাড়ীতে রিক্সতে সে তাহা পার হইয়াছে। তাই এই নদীসঙ্কুল দেশ দেখিয়া একে তাহার বিস্ময়, ভীতির পরিসীমা ছিল না, তাহাতে এই কাণ্ড। সে যেন ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, নদেরচাঁদ তাহাকে কোনও মতে উপরে তুলিয়া আনিয়া সুস্থ করিয়া বলিল—রমেনবাবু! আপনি যেখানেই যান না, আজ আমার সঙ্গে আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে, তা নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। আমি এ-সব মাল-পত্র মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলচি, আপনারা কষ্ট করে আমার সঙ্গে চলুন, লণ্ঠনটা আমার হাতেই থাকবে, কোনও ভয় নাই আপনাদের।

রমেন একবার ঘোমটাস্থিতা কাকীমার মুখপানে তাকাইল, এবং একবার ময়নার অন্যদিকে ফেরানো অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখ-পানে চাহিল। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে যেন ইঙ্গিত পাইল না, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাইতে। রমেন তাই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল।

নদেরচাঁদ বলিল—ওকি রমেনবাবু! কথা কইছেন না যে? ভিজে কাপড় শীগগির না ছাড়লে যে অসুখ কর্ব্বে। চলুন, রমেন

বাবু! নদেরচাঁদের কথায় রমেনবাবু কিন্তু বিশেষ সাড়া দিল না, বা নড়িল না।

এদিকে ষ্টীমার ছাড়িয়া গিয়াছে, ষ্টেশন হইতেও যে যাহার মালপত্র বহিয়া লইয়া একে একে যাইতেছে। নদেরচাঁদ সহসা রমেনবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রমেনবাবু! আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। আপনাকে এঁদের নিয়ে এই দিগরাতে বনের পথে এই বিপন্ন অবস্থায় আমি কিছুতেই ছাড়চিনা। রমেন অনন্যোপায় হইয়া বলিল—বাবু! আপনি এঁদের বলুন।

সাধিকা তখন অস্ফুটকণ্ঠে নেপথ্যে রমেন-দাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—রমেন-দা! ভদ্রলোককে বলুন—আমাদের ক্ষমা কর্ত্তে হবে। সাধিকা ফিরিয়া তাহার গলা ছোট করিয়া মাতাকে বলিল—মা এ অন্যত্র নয়, আমাদের বর্ত্তমান-অবস্থায় যেথানে সেখানে গিয়ে ওঠা কোনও মতেই উচিত না।

নদেরচাঁদ আর রমেনবাবুর মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি পুনরুচ্চারিত শুনিতে অপেক্ষা করিতে পারিল না, কারণ সে উহা সমস্তই নিজ-কাণে শুনিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—

বৌদি! আমি ভদ্দর-লোক একটুও নই। বামুন বটে, তবে ছোট-লোকের একশেষ, গোঁয়ার, গামাল। আমি যা বুঝি, তা করি, আধুনিক শিক্ষিতদের মত দো-ভাষায় কথা বলি না। বৌদি! ইনি আপনার মা তো? মাঐমা! পায়ে ধরচি,

আপনার পায়ে মাথা লোটাচ্চি, আমি যা বলেচি, তা আপনাদের কর্ত্তেই হবে। আর না হয়, আমি এখানে শুচ্চি, আপনারা আমার মাথা মারিয়ে, আমায় পথে সরিয়ে রেখে, যেখানে হয় যান, নইলে আমি পথ-রোধ করে রাখলাম। মাঐমা! তা কি হতে পারে? যাঁদের আমি জল থেকে ডাঙ্গায় তুলেচি, তাদের আমি বনে ফেলে কি করে যাবো? অন্ধকারে আলো নিভিয়ে ঘরে যখন শোবো, এই অন্ধকার দেখেই তো আমার প্রাণ কেঁদে উঠবে—আপনাদের কোথায় অন্ধকারে ফেলে চলে এলাম।

নদেরচাঁদ না-ছোড়বান্দা হইল। অবশেষে তাঁহারা সকলেই নদেরচাঁদের সঙ্গে নদেরচাঁদের বাড়ী গিয়া পৌছিলেন।

ব্রহ্মময়ী তখন চরকায় তূলা কাটিতেছিলেন, রাত্রি প্রায় দশটা। ব্রহ্মময়ী এই আগন্তুকদের দেখিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন।

'ও হারামজাদা! তোর এমন কম্ম? ভদ্র লোকদের ষ্টেশন থেকে আনলি—শুনেচি আমি ভোম্বলের কাছে, রাতের ষ্টীমারের সিঁড়ি ভেঙ্গে অনেক লোক জলে পড়ে গেচে। পাজি! দৌড়ে কেন বাড়ী এলিনা? ঘরে কি শ্বশুর-পিতৃ-পুরুষের আশীর্ব্বাদে কাপড়ের অভাব ছিল? কেন এঁদের ভিজে-কাপড় ছাড়িয়ে আনলি না? বয়াড়! দে এঁদের নতুন লাল পেড়ে সাড়ী সিন্দুক থেকে বের করে। আর ঐ ভদ্রলোককে দে একখানা সরু লাল পেড়ে ধুতি। আর আপনি মা! এই নতুন কাঁচা সাদা কাপড়খানা

পরুন। আপনার আশীর্ব্বাদে উনি অনেক থানের কাপড় পান, বছরে ও-রকম দুই দশ থানা গরীব দুঃখী বিধবা মেয়েদের আমি বিলাই। ও কমলা! আয় আলোটা নিয়ে। এই দেখ, তোর বয়সী একজন এসেচে। আজ তোর রাত্তিরে বেশ ঘুম হবে। নাঃ, আর ঘুম না. গল্প করেই কাটাবি, তা কি আমি বুঝি না? মা! আপনি কাপড় ছেড়ে বসুন। যাও বৌ মা! ঘরে যাও। ঐ যে আমার ঘর-আলো-করা-পুতের-বৌ। নদেরচাঁদ! ড্যাকরা! দাঁড়িয়ে আছিস? ঐ ভদ্র লোককে কাপড় ছাড়িয়ে বসতে দে, তামাক দে।

সমস্ত কার্য্য যেন নিমেষে হইল। ব্রহ্মময়ী ইন্দুমতীর সহিত বসিলেন। কমলা সাধিকাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া রান্নাঘরে গেল, তাহার ছেলে মেয়েরা তখন ঘুমাইতে ছিল। নদেরচাঁদ তখন রমেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল।

ইহাদের আতিথ্যে ও সম্ভাষণে আগন্তুকগণ সকলেই প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু সাধিকার মন যেন দুলিয়া, ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সে চিন্তা করিতে লাগিল—কে এই জন, যে তাহাদের ষ্টেশন হইতে এত সমাদরে বাড়ী লইয়া আসিয়াছে, যাহার নাম এই বাড়ীর গৃহিনী কিছু পূর্ব্বে উচ্চারণ করিলেন? সাধিকা ভগবানের পায়ে নিবেদন জানাইল—'ভগবান! এক নামে এক গ্রামে যেন দুইজন থাকে।' ভগবান এই নবাগতা নবীনার করুণ-প্রার্থনা

শুনিলেন কি ? নদেরচাঁদ নামে কিন্তু এই গ্রামে দুইজন হইল না। সাধিকার উৎকণ্ঠিত মন অনতিবিলম্বে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া কমলার মুখ হইতে তাহা পাকে-চক্রে শুনিয়া লইল। সাধিকা প্রমাদ গণিল।

সে রাত্রি যেন কমলা বা নদেরচাঁদের কাছে প্রভাত হয় না। নদেরচাঁদ রমেন বাবুর ঘরে শুইয়াছিল। কমলা ও সাধিকা এক বিছানায়ই রাত্রি যাপন করিয়াছিল। এবং ব্রহ্মময়ী ইন্দুমতীর পার্শ্বে ছিলেন।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হাতমুখ না ধুইয়াই নদেরচাঁদ কমলার ইচ্ছানুযায়ী চারু-দির কাছে গেল। কমলা নদেরচাঁদকে বলিয়া দিয়াছিল, যে সে চারুদিকে ইহা বলিবে—চারু-দি কমলার মরা-মুখ দেখেন, যদি তিনি এই সঙ্গে না আসেন। নদেরচাঁদ চারু-দির কাছে কমলার শেখানো-কথা ভিন্ন অন্য কিছু না বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

এ পল্লীগ্রাম, সহর নয়। অনতিকালমধ্যে গ্রামের সকল লোকই জানিল—ষ্টীমার ঘাটে কি ঘটিয়াছে, এবং নদেরচাঁদের বাড়ীতে কাহারা আসিয়াছেন। গ্রামের অধিবাসী সকলে মেয়ে-পুরুষ দলে-দলে এই বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং এই আগন্তুকগণের নূতন সাজ, আধুনিক কায়দা দেখিয়া তারিফ করিতে লাগিল। এক বৃদ্ধা তো বলিয়াই ফেলিল—তোমরা বল, নদেরচাঁদের বৌ অপ্সরা,

দেখ তো এই বৌটি এসেছে, যেন ডানা-কাটা পরী। অন্য প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল—উনি কারা ?

*　　*　　*　　*　　*

মধ্য-পাড়ার ভটচার্য্যিদের বাড়ী আজ ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন হইবে। গ্রামের মাতব্বর ব্রহ্মাণ্ডনাথ যে সভাপতি হইবেন, ইহার নিমন্ত্রণ গতপরশ্ব ব্রহ্মাণ্ডনাথ লোক-মারফত পাইয়াছিলেন। আজ বেলা তিনটার সময় দলে দলে শশি ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের নাট-মন্দিরে ব্রাহ্মণ দলপতিরা আসিয়া ভিড়িলেন, এবং মস্ত বড় একটা আগুনের কুণ্ড হইতে শশি ভট্টাচার্য্যের চাকর দুইজন কলকিতে আগুন তুলিতে লাগিল, আর চারি পাঁচটা হুঁকা অবিরল হাত-বদল করিবার ব্যবস্থা করিল।

রাজকুমার চক্রবর্ত্তী বলিল—ছি ছি ছি! জাত-ধর্ম্ম রসাতলে গেল !. গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোটা গলায় তামাক টানিতে টানিতে জবাব দিলেন—'রাজু খুড়ো! তুমি বল খালি খালি, দোষ উদ্ধব সমদ্দারের, আর ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড নদে-বেটার।

রাজকুমার। কেন ? নদেরই বা কি দোষ ? উদ্ধব সমদ্দারেরই বা কি দোষ ? একজন এসেচে অন্য দেশ থেকে, এসে বিপদে পড়েচে ; খেলা কথা তোলা ? জলে পড়েচে, তাতে নদে তাদের ঘরে এনেচে, এতে তার বা তার বাপের কি মহাদোষ হয়েচে ?

গিরিশ। তবে তুমি বল—দোষ কার ?

রাজকুমার। তা বলতে গিয়ে জেল খাটবো ?

গিরিশ। না, বলোই না।

রাজকুমার। না, বলবো না, এ-দেশ খারাপ, এ-দেশের বাতাসের কাণ, মুখ, সবই আছে।

গিরিশ। বাঃ! কি মুস্কিল।

রাজকুমার। তুমি তা বুঝবে কি ? বয়স হতে এলো সত্তর, কিন্তু বুদ্ধির মাথাটি খেয়েচো ? যদি নিজে কিছু না বোঝ, তবে বাড়ী গিয়ে গিন্নী-ঠাকরুণকে পাঠিয়ে দাও, তিনি সভা-সমিতি করুন। তোমার কাজ না সমাজ-রক্ষা। যে দিনকাল পড়েচে— বুঝতে পার না এই হালী-আমদানী দেখে ? যে লোকটা এদের সঙ্গে নিয়ে এসেচে, সে বলে ভাই-ব্রাদার, আপন কেউ না।

গিরিশ। তাই নাকি ?

রাজকুমার। আরে সেই বিমানবাবুও যা ছিলেন, রমেনবাবুও তাই।

গিরিশ। রাজু-খুড়ো! মানুষ হও তো, এদের এ-দেশে স্থান দিও না, এ-বীজ বড় সাংঘাতিক, দেশশুদ্ধ ছেয়ে ফেলবে। এ কচুরিপানা, তা জান ?

রাজকুমার। এসেচি তো তাই কর্ত্তে। এখন দেখি ন্যায়-পঞ্চানন, স্মৃতিরত্ন-মশায়রা কি বলেন ? আর যে-ঘরের কাণ্ড, তাতে পণ্ডিতমশায়দের বাক্যি সরলে হয়।

ইত্যবসরে ব্রহ্মাণ্ডনাথকে অদূরে আসিতে দেখিয়াই চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা সুর পাল্টাইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—

রাজকুমার। এ নাটমন্দিরখানা বেশ বড়, বেশ পাঁচশো লোক এখানে বসতে পারে।

গিরিশ। কতকালের তৈরী, এখনও ঠিক আছে।

রাজকুমার! না, জায়গায় জায়গায় ঘুণ ধরে গিয়েচে। এখানে প্রতি পূজায় থিয়েটার, যাত্রা, কথকতা, পুঁথি প্রভৃতি হয়। বেশ, দেশের একটা আড্ডা, সভা-সমিতি, কমিটির জায়গা।

ব্রহ্মাণ্ডনাথকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উপস্থিত সভ্যগণ কেহ দাঁড়াইল, কেহ হাই তুলিয়া হাত দুইখানায় আলস্য ঝাড়িয়া প্রেসিডেণ্টমহাশয়কে অভ্যর্থনা জানাইলেন। ক্রমে একে একে ছোটতে বড়তে ঘরখানার অর্দ্ধেকাংশ ভরিয়া গেল।

প্রেসিডেণ্টমহাশয়কে আর উঠিতে হইল না। তিনি মধ্যস্থলে সেই পাতা-সতরঞ্চির উপরই বসিলেন। দূরে নিকটে সভ্যগণ, দর্শকগণ উপবেশন করিলেন। তামাকের ধূম্রে যেন সেই ঘরের উপরাংশটায় মেঘ জমিল। কেহ খো খো করিয়া কাসিয়াও তামাকের টানের মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না, কেহ ঐ সময়ের মধ্যেই পৈতা কাণে জড়াইয়া গাড়ু লইয়া প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেল। অদূরে কয়েকজন যুবক ধবধবে ফতুয়া পরিয়া, কেহ

বা চোখে সোণার-সেলের চশমা দিয়া বৃদ্ধদের অদ্ভুত স্বভাবের নিন্দা-বাদ করিতে লাগিল।

প্রেসিডেণ্টমহাশয় তখন সভাস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কিসের সভা? কি উপলক্ষ করে এ-সভা ডাকা হয়েচে, তা তো আমি কিছুই জানি না। যে চিঠি নিয়ে গেছলো, সেও কিছু বলতে পাল্লে না—কি জন্য সভা হবে।

সভ্যবৃন্দ সকলেই মৌন রহিল। সভাস্থল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। একটি মধ্য-বয়স্ক সহসা বলিয়া ফেলিল—আপনার ভাগ্নে কার্ত্তিকের বউ নাকি নিজের মাকে সঙ্গে করে, আর একটি বন্ধু নিয়ে, সেধে শ্বশুর বাড়ী এসেচেন, তাঁকে আপনারা নাকি আগে ত্যাগ করেছিলেন। আজ এই সভা এঁরা এজন্য ডেকেচেন, যে তাকে ঘরে নিতে হলে গ্রাম্য সমাজ-বন্ধন অনেক শ্লথ হয়ে যায়। তাই সভ্যরা জানাচ্চে, এখন আপনি এই ব্রাহ্মণ সভার প্রবর্ত্তক ও সভাপতি; আপনি এ বিষয়ে এই সভায় যা হোক মতামত দিয়ে যাবেন; এঁরা তাই-ই আশা করেন।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ যেন জলে পড়িলেন, বা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে যেন হঠাৎ সূর্য্যটা আকাশ হইতে কেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিল, অথবা কি যে ঘটিল, তাহা তিনি নিজেই জানেন না। এই সময়ে নদেরচাঁদ সভামণ্ডপে আসিয়া বলিল—বড় মামা! এখানেই, এই নাকারির পেছনেই চারু-দি এসেচেন, তিনি

আপনাকে একটি বার ডেকেচেন। আপনি না গেলে তিনি নিজে এখানে উপস্থিত হবেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথ সকলের অনুরোধে—'আগে ঐ কাজটা সেরে আসুন, তারপর কথা হবে'—গাত্রোত্থান করিয়া চারুর কাছে গেলেন।

বড় মামা যাইতেই চারু বড়মামার পা দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল—বড় মামা! তুমি কিছুতেই এঁদের বাড়ীতে রাখতে অমত কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমরা একঘরে হয়ে থাকবো, সেও ভাল, তুমি কার্ত্তিকের বউকে ফেলতে পারবে না। বড় মামা! আমি মাকে বুঝিয়ে, বলে-কয়ে ঠিক রাখবো। কার্ত্তিক কোথায় গেচে, তার অবর্ত্তমানে তার বৌ যেন অপমানিতা হয়ে চলে না যায়।

ব্রহ্মাণ্ড আকাশ জুড়িয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—ও সব ছেলে-মানষী কর্ত্তে গেলে সমাজ রাখা চলে না। স্ত্রী-নায়ক, বহু নায়ক হলে সংসার মাটি হয়।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ তন্মুহূর্ত্তে এক ঝাঁকা দিয়া চলিয়া গেলেন। চারু-দি সেই ধূলায়ই লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নদেরচাঁদের বক্ষঃ যেন তখন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ পূর্ব্ব হইতেই রাগিতেছিলেন, এবং চারুর ব্যাপারে আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি সভাস্থলে পুনরায় আসিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও ন্যায়পঞ্চাননমহাশয় ব্রহ্মাণ্ডনাথের অনুপস্থিতি সময়ে শাস্ত্রের বচন আওড়াইতে আওড়াইতে মুক্ত-কচ্ছ হইয়া গিয়াছিলেন, এবং দুইজনে বিষম শাস্ত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডনাথের পুনরাগমনে উহা পুনরায় মহামারী ব্যাপারে পরিণত হইল। তাহার সারার্থ এই, কার্ত্তিকের বৌয়ের ব্যভিচার-দোষ ব্রহ্মাণ্ডনাথকে দুষ্ট তো করিবেই, অধিকন্তু এজন্য উদ্ধব সমাজদার, তাঁহার পুত্র নদেরচাঁদ, ও উদ্ধবের পরিবারবর্গ অশুচিগ্রস্ত, সুতরাং এরা সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আপনারা থামুন, থামুন, আমি দেখচি, দেখচি, সমাজের কোনও অন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডনাথ থাকতে হবে না। অবিলম্বে এই বেশ্যার দলকে মুড়ো-মাথা করে, মাথায় ঘোল ঢালবো। ব্রহ্মাণ্ডনাথের সে রক্তে জন্ম নয়। সে হিন্দু। তার সমাজ তার নিজের হৃদয়, তার পল্লী তার নিজের বক্ষঃ-পঞ্জর।

বলিতে বলিতে অসংখ্য ইট-পাটকেল যেন কামানের গোলার মত সেই সভায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। রাজকুমার মাথায় ঘা খাইয়া পড়িয়া গেল। গিরিশ নীচু হইয়া শতরঞ্চিতে শুইয়া পড়িয়া কোনও মতে বাঁচিল। ন্যায়পঞ্চানন, স্মৃতিরত্নমহাশয় দোহাই বাবা! রক্ষে কর, রক্ষে কর, প্রাণে মেরো না, প্রাণে মেরো না বলিয়া অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় দৌড়াইল। ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিস্তব্ধভাবে

দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, নদেরচাঁদ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ইট ছুঁড়িতেছে। ব্রহ্মাণ্ডনাথ নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—নদে! ফৌজদারীর আসামী কর্ব্ব জানিস? নদেরচাঁদ বলিল—তা হলে আপনার ভাগ্নী চারু-দিকে আদালতে হাজির করাবো, তাও জানবেন। বলুন, যে পাষণ্ডরা কার্ত্তিকের বৌয়ের বিষয় এই সব খারাপ কথা মুখে এনেছিল, তাদের জব্দ কর্ব্বেন, আর এ গ্রামে আমরা দুই-ঘরে এক-ঘরে হয়ে থেকে কার্ত্তিকের বৌকে ঘরে নেবো। তবে আমি এ অত্যাচার আর কর্ব্ব না। নইলে ও-শালাদের মাথা ভেঙ্গে আসামী সেজে আপনাকে, কাকীমাকে, চারু-দিকে জজ ম্যাজিষ্টেটের কাছে উপস্থিত করাবো। এ যদি না পারি, তবে আমার নাম 'নদে' নয়।

অদ্যকার এই সমস্ত সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া অরুন্ধতীর কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বে চারু ভ্রাতৃবধূ ও তাহার মাতাকে নানা কথায় বুঝাইয়া লইয়া নিজেদের বাড়ী ফিরিল। অরুন্ধতী আগন্তুকদের পাইয়া কথাবার্ত্তা বলিবেন, কিন্তু তাঁহার ভয়—দাদা। দাদা না বলিলে তিনি যে ইঁহাদের সহিত মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। চারুই ইঁহাদের ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, দেখাইয়া, শুনাইয়া অনেকক্ষণ ব্যাপৃতা করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা লাগিয়া গেলে ব্রহ্মাণ্ডনাথ অরুন্ধতীর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৈবাহিক ও বধূমাতকে নিজের ভগিনীর

বাড়ীতে দেখিয়া আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—

অরু! তুই কুলটারদলকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিস? তবে থাক তোরা, আজ থেকে আমি তোদের বাড়ী থেকে বিদেয় নিচ্ছি। কি! এত বড় কথা!

এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাথ দুপ দাপ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন নামিয়া গেলেন। অরুন্ধতী বসিয়া পড়িল, চারু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইন্দুমতী ও সাধিকা নদেরচাঁদদের বাড়ী পৌছিয়াই পরদিন রমেন-কে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তখন তাঁহারা পুনরায় অসহায় বোধ করিলেন। কিন্তু তদবস্থায়ও সাধিকা শ্বশ্রূমাতার পদে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, চারু-দিকে দুই হাতে সাপ্টাইয়া ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার পায়ের ধুলি গ্রহণ করিল।

ইন্দুমতী হতচৈতন্যের মত বসিয়াছিলেন; তাঁহাকে সাধিকা বলিল—মা! ওঠ, রাত হয়ে যায়, এগারটায় কলকাতার ষ্টীমার ছাড়বে।

মাতা উঠিলেন। তিনি বৈবাহিকাকে নমস্কার করিয়া, চারুর চিবুকস্পর্শ করিয়া, চুমা খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। অরুন্ধতী নির্বাক, চারু কিছু বুঝিতেছিল না।

সাধিকা বলিল—মা! আসি তবে? চারু-দি! ক্ষমা করো।

গ্রাম্য-পথে অন্ধকারে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে করিতে মাতা ও কন্যা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন।

চারু তখন ছুটিয়া নদেরচাঁদের বাড়ী গিয়া সমস্ত ব্যাপার নদের-চাঁদকে জানাইল। চারু আর সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল না। কমলা ও চারু দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

সে রাত্রিতে ষ্টীমার আসিতে বিলম্ব হইল, কিন্তু তবুও আসিল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া গিয়া নদীর অনেকদূরে চলিতেছে এই সময়ে নদেরচাঁদ বলিল—

'মাঐমা! আমি দোতলায় ফাঁকা-জায়গায় বিছানা করেচি। বৌদি! তুমি ঐ পুঁটুলিটা দাও তো। ষ্টীমার দৌলতপুর পৌছতে প্রায় ভোর হবে।'

সপ্তকাণ্ড

"নর-রামায়ণ" মহোপন্যাসের "গলার-কাঁটা" নামক দ্বিতীয়কাণ্ড সমাপ্ত।